শিথিল-কবরী।

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

ভাদ্র, ১৩৩০

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

একটাকা চারি আনা।

প্রকাশক—

শ্রীজীবন কৃষ্ণ সেন।

১০৪।৩ বলরাম দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

ভিক্টোরিয়া প্রেস,

২১এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন (সিমলা), কলিকাতা।

দু'একটি কথা

লক্ষ্মীপ্রতিমা ও শিথিল-কবরী দুইখানি পুস্তকই আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ সেনের আন্তরিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং সাফল্য লাভ তাহারই। ইতি—

গ্রন্থকার।

প্রকাশকের নিবেদন

লক্ষ্মীপ্রতিমা প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক জায়গা হইতে শিথিল-কবরীর তাগিদ পত্র আসাতে পুস্তকখানি বড় তাড়াতাড়িতে বাহির করিতে হইল। সময় সংক্ষেপ হওয়ায় পুস্তকের মধ্যে নানাস্থানে ছাপার ভুল লক্ষিত হইবে। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা বর্গের নিকট এইজন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। ইতি—

বিনীত—

প্রকাশক।

উৎসর্গ

স্বর্গীয় মহৎ উদার-হৃদয় বন্ধু সুরেশ চন্দ্র দের উদ্দেশে—

সুরেশদা,

শাপভ্রষ্ট দেবতার মতই দুদিন মর্ত্ত্যের বুকে নেমে এসেছিলে; শাপ মোচন হ'তেই আবার নিজের স্থানে ফিরে গেলে, কিন্তু মমতার বস্তু যা দুদিনের তরেও এ মরজগতে পেয়েছিলে, আজ স্বর্গে ব'সেও কি তাদের মায়া কাটাতে পেরেছ? তা যদি পারতে তা হ'লে হে স্বর্গের দেবতা! তোমার জন্য সকলের বুক এমন অহঃরহঃ তুষের আগুনে পুড়ে যেতনা।

আজ তোমার পবিত্র সৌম্যমূর্ত্তি মনে এঁকে এ ক্ষুদ্র অর্ঘ্য তোমারই উদ্দেশে নিবেদন ক'রছি—অকৃতজ্ঞ ভেবে যেন ফিরিয়ে দিওনা—যাকে আপদে বিপদে নিবিড় স্নিগ্ধ ছায়ায় বাঁচিয়ে রেখে গেছ তার শোকাশ্রুসিক্ত এ অর্ঘ্য কি তোমার দিব্য দৃষ্টিকে এতটুকু আকর্ষণ করে আনতে পারবে না?

জীবন-মিলন লাইব্রেরী,
জন্মাষ্টমী—ভাদ্র, ১৩৩০।

ভাগ্যহীন
ব্যোমকেশ।

উপহার

এই গ্রন্থখানি

আমার

কে

প্রদত্ত হইল।

তারিখ স্বাক্ষর

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

১।	লক্ষ্মীপ্রতিমা	(সামাজিক উপন্যাস)	মূল্য ।৵০
২।	শিথিল কবরী	(ঐ)	মূল্য ১।০
৩।	সোনালি	(ঐ)	মূল্য ১।০
৪।	স্বর্ণমন্দির	(ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে)	যন্ত্রস্থ

শিথিল-কবরী

নিখিলনাথের কথা

(ক)

মা বাপের একটি ছেলে সবে ধন নীলমণি হ'য়েও আমি কখনও চাঁদ আমার গোপাল আমার করা আদর পাইনি ব'লে যা কিছু একটু লেখাপড়া শিখ্‌তে আরম্ভ ক'রেছিলাম, সেবারে ইণ্টারমিডিয়েট্‌ পরীক্ষা দেওয়ার পরে দেশে এসে দুদিন আরাম কর্‌তে না কর্‌তেই যখন রতনপুরের ম্যালেরিয়া (এক রকম বারমেসে ব'ল্‌লেই হয়) আমাকে বেশ আঁটিশুটী দিয়ে চেপে ধর্‌লে, তখন কোথায় রইল আমার আরাম, আর কোথায় বা রইল আমার এতদিনের সাধের হুইল আর ছিপ্‌ সুতো।

পুরোপুরি তিনটি মাস নাকানি চুবুনি খাওয়ার পর যেদিন রক্তহীন চামড়ায় জড়ান হাড় কখানা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পার্‌লাম, সেদিনকার সে দিব্য দেহ দেখে, মায়ের আমার আর কান্নার সীমা পরিসীমা রইল না।

মস্তবড় তালুক মুলুকওয়ালা জমিদার না হলেও বাবা আমার নিতান্ত কম ধনশালী ছিলেন না। উনিশ বছর বয়সে চাকরীতে ঢুকে পুরো চল্লিশ বছর চাকরি ক'রে তিনি যা সঞ্চয় ক'রেছিলেন, তাতে ইচ্ছে ক'র্‌লে দশ বিশ জন গালপাট্টাধারী দরওয়ান বা পাঁচসাত জন তিলক কাটা উৎকলানন্দ পাচক ব্রাহ্মণ রাখার মত ক্ষমতা তাঁর যথেষ্টই হয়েছিল। ব্যয়বাহুল্যবশতঃ এসবের দিকে তাঁর কখনও ঝোঁক দেখিনি।

তারপর মায়ের কান্নায় আর সর্ব্বোপরি আমার মরণাপন্ন-অবস্থা দেখে, বাবা আমায় পাঠালেন বায়ু পরিবর্ত্তনে; ঠিক বৈদ্যনাথ মধুপুর না হ'লেও তেমনি স্বাস্থ্যকর একটা ছোট খাট পাড়াগাঁয়ে—আমার মাসীমার বাড়ীতে। নিঃসন্তান্ স্নেহময়ী মাসীমার কাছে থাক্‌ব ব'লে সঙ্গে আসার কারও দরকার হ'ল না।

মাসীমার এখানে এসে, দুচার দিন চার্‌টি চার্‌টি ক'রে খেয়ে আর লাটির সাহাযো এদিক ওদিক ঘুরে, শরীরে আগেকার চেয়ে একটু বল পেলাম। এখন আমার ডায়েরী লিখতে হ'লে এই লিখ্‌তে হয়—সকালে উঠে কব্‌রেজের মৃত সঞ্জীবনী রস, সর্ব্বজ্বর-হরলৌহ, কালান্তক চূর্ণ ইত্যাদি নানা অনুপানের সঙ্গে সেবন আর পশ্চিমের খোলামাঠে প্রাণমাতান-পাগলকরা বাতাস গায়ে মেখে ঘণ্টাখানেক সকাল বেলায় ভ্রমন, ফিরে এসে ছমাস নমাস রোগে ভোগা লোকের মতই কিছু পথ্যগ্রহণ। তারপর দিব্য আরামে

হরেরাম মুদীর দোকানে চটের ছাওনি দেওয়া বল্টুন সাহেবের আমলকার ছোট্ট মোড়াটির উপর ব'সে ক'ল্‌কাতার ট্রামগাড়ী মোটরগাড়ীর সংঘর্ষ আর তাদের আশ্চর্য্য রকমের লোক চাপা দেওয়ার দক্ষতার বিষয় পাঁচজনের কাছে গল্প করা।

শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দিনগুলো এই একঘেয়ে রকমেই কেটে যাচ্ছিল, হঠাৎ সেদিনকার সকাল বেলার একটা সামান্য ব্যাপারে ডায়েরীর পাতাটা উল্টে আরও একটু ঘুরিয়ে লেখবার মত হ'য়ে উঠ্‌লো।

আমার নিত্য সকাল বেলাকার ভ্রমণ শেষ ক'রে মাঠ থেকে ফিরে আস্‌বার পথে গাঁ ঢুক্‌তেই ছিল একটা পুকুর, তার চার পাশে কলা পেঁপে বেগুন কুমড়ো এই রকম আরো তরকারীর গাছপালা। সেই দিনই শুন্‌লাম সেটা নাকি ঐ গ্রামেরই ঘোষ বাবুদের। মাসীমার মত টাকাকড়ি জমি জায়গা না থাক্‌লেও, অন্য সকলের চেয়ে তাঁরা সবদিকেই বড়মানুষ। এই সমস্ত তরি-তরকারী বেচে নাকি সারা বছরে তাঁদের একটা বেশ মোটা রকমের আয় হয়।

সে দিন বেড়িয়ে ফিরে আস্‌ছি, দেখি না বাগানের মালিটা একটি বার তের বছরের মেয়ের চুলের মুঠি ধ'রে অপমান ত কচ্চেই, তা ছাড়া এই মারে ত এই মারে ব্যাপার আরম্ভ ক'রে দিয়েচে। কাছে গিয়ে ঘটনাটা যা বুঝলাম তা এই :—

মেয়েটি বাগান থেকে গোটাকতক কুমড়োর পাতা আর ঠিক গুণে চারটি লঙ্কা তুলেচে তাই তার কাছ থেকে বাগানের মালি এ নগদ মূল্য আদায় করে নিচ্ছে। মেয়েটি বলে সে নাকি বুড়ো ঘোষকর্ত্তার কাছে অনুমতি নিয়েই বাগানে এসেছিল এবং আরও কিছু তরকারি যে তার দরকার সেকথাও তাঁকে ব'লে এসেই এই লঙ্কা আর কুমড়ো-পাতা তুলেছে। কিন্তু মালি তা বিশ্বাস করতে চায় না; কারণ বাগান নাকি তারই খবরদারীতে।

যাহোক্ আমি ভদ্রঘরের মেয়েকে, অবশ্য গরিবের ঘরেরই, এই ছোট লোকের হাতের অপমান থেকে বাঁচিয়ে সঙ্গে ক'রে বাগান থেকে বাইরে নিয়ে এলাম। পথের ধারের গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে তাকে তার বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করায় সে ব'ল্লে, ঐ যে চারদিকে ঘন বাঁশঝাড়ের বেড়া দেওয়া পুকুরটি, ওর ধারেই তাদের বাড়ী।

তখন সকাল বেলাকার কাঁচাসোনার রঙমাখান চক্‌চকে রদ্দুর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সদ্যস্নাতা কিশোরীর দেহের এখানে সেখানে এসে লুটোপুটি খাচ্চে আর দক্ষিণের ঝির-ঝিরে পাগলা বাতাস তার রুক্ষ একরাশ চুলের গোছায় ঝাপিয়ে প'ড়ে দোল খাচ্চে। মালির নির্য্যাতনে বাঁ হাতের চুড়িগুলি ভেঙ্গে গেছ্‌লো ব'লে সে ডান হাতখানি দিয়ে বাঁ হাতের কর ধ'রে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ছলছল চোখে চেয়ে বল্‌লে, "আমাদের

বাড়ীতে চলুন না, এই ত বেশী দূরে নয়; তেমন কষ্ট হবে না। ওখানেই একটু জিরিয়ে নেবেন।"

রোগে ভুগে ভুগে শরীরখানাই আমার কঙ্কালসার হ'য়েছিল; তাই ব'লে চির দিনকার সরস মনটা ত আর নীরস হয়নি। গরীব হ'লেও এই কিশোরী বালিকার সজল চোখের চাহনি আর তার আকুল ভাষার অনুরোধ আমি এড়াতে পারলাম না। তার সঙ্গে তাদের সেই আধভাঙ্গা, অথচ অত্যন্ত পরিষ্কার ঘরখানির দাওয়ায় গিয়ে আমাকে ব'সতে হ'ল।

শুনেছি লক্ষ্মীঠাকরুণ চঞ্চলা। এই ক্ষুদ্রা কিশোরীর অঞ্চল ধ'রে তিনি ব'সে না থাকলেও একেবারে যে বাড়ী ছেড়ে চ'লে যান নি তা প্রথমেই টের পেলাম—সেই ঝক্‌ঝকে উঠানটি দেখে। তার একধারে যত্নেগড়া তুলসী মঞ্চটির পানে তাকালে আর যেন অন্যদিকে চাইতে ইচ্ছে করে না। ভোরের আধফোঁটা স্থলপদ্মগুলি দীন ভক্তের ক্ষুদ্র প্রাণের বিপুল ভক্তির সজীব সাক্ষী হ'য়ে বেদীর চারধারে অতি পরিপাটি রকমে সাজানো, আর এইমাত্র অঞ্জলি দেওয়া শিউলীর রাশ, তারই কাছে ভক্তের অর্ঘ্যের নিশানা বুকে ধ'রে এলোমেলোভাবে ছড়ানো। চোখ আমার জুড়িয়ে গেল।

ঘরের ভেতর আসন পেতে ব'সে অনুচ্চস্বরে যিনি গীতা পাঠ করছিলেন, বালিকা তাঁকে ডেকে কাঁদ কাঁদ হ'য়ে ব'ল্লে, "বাবা তোমার কথায় ঘোষ কাকাকে ব'লেও বাগানে ঢুকতে

মালিটা আমার যা হাড়ীর অপমানটা কর'লে—" বৃদ্ধ বয়সে না হ'লেও দারিদ্র্যের অত্যাচারে দেখতে কতকটা তাই হ'য়ে প'ড়েচেন বটে,—চশমা জোড়া কোঁচার খুঁটে মুছতে মুছতে ক্ষোভের হাসি হেসে বললেন "আশ্চর্য্য নয় মা গরীবের মেয়েকে অমনধারা অপমান করাটা সকলের পক্ষেই সোজা। ইচ্ছে হ'লেই হ'ল। তবু খাতির ক'রেচে—গায়ে হাত তোলেনি—"

"হাঁ খাতির ক'রেচে। চুলের মুঠি ধ'রে—" বালিকার আর বলা হ'ল না; দুঃসহ কান্নার বেগ সইতে না পেরে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

আমি ব'ল্‌লাম, "থাক সে সব কথা আর কখনো পরের কাছে কিছু চাইতে যেওনা। নিজের যা খুদ গুঁড়ো জোটে তাই ভাল।"

বৃদ্ধের ক্লিষ্ট মুখে আবার সেই ক্ষোভের হাসি। "খুদ-গুঁড়োও যে জোটে না বাবা। তুমি কে, তা না জেনেই তোমায় অনেক কথা ব'লচি কিছু মনে নিওনা।" বালিকা কতকটা সামলে নিয়ে ব'লে উঠল, "উনিইত আমায় সেই রাক্ষুসে ছোট লোকটার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, ছোট গিন্নীমার বোন্‌পো উনি। দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগছিলেন তাই এখানে শরীর সারতে এসেচেন। তুমি বাড়ী থেকে কোথাও যাও না ব'লে চেন না। নইলে সব্বাইকার সঙ্গেই ত ওঁর খুব আলাপ পরিচয়। এই সতরঞ্জিটার

ওপর ভাল হ'য়ে বসুন না নিখিলবাবু! ইস্! গা দিয়ে যে ঘাম ঝর্‌চে। এই বাতাসে— এইখানটায় স'রে ভাল হ'য়ে বসুন।"

"আচ্ছা সে বস্‌চি আমি, তোমায় তার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না; কিন্তু আমার যে ওষুধ খাবার সময় হ'য়ে এল— আমায় যে এক্ষুণি যেতে হবে; ওবেলা এসে না হয়—।"

"আপনি বসুন না। আমি সব ছোটমার কাছ থেকে নিয়ে আসচি, সকালবেলা কি ওষুধ খান তিনি জানেন ত, না আপনি ব'লে দেবেন? আমি যাব আর নিয়ে আস্‌ব।"

এত বড় যত্ন আর এতখানি আত্মীয়তার বাঁধন ছিঁড়ে আমি 'না' কথাটা ব'লতে পারলাম না। ওষুধের জন্যে বালিকা মাসীমার বাড়ী রওনা হ'ল। তারপর বৃদ্ধের দিকে চেয়ে আমার পরিচয় দিলাম—"বৰ্দ্ধমান জেলায়—রতনপুর গ্রামে আমার বাড়ী, নাম নিখিলনাথ চট্টোপাধ্যায়—পিতার নাম—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে কিছুদিনের মত আমায় এখানে আসতে হ'য়েচে, আগের চেয়ে আজকাল অনেক ভাল আছি এবং দিন দিন ভাল ব'লেই মনে হচ্ছে। আর কিছুকাল এখানে থাকলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে পারবো"—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

"আশীর্ব্বাদ করি ভগবানের দয়ায় শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর আগের

স্বাস্থ্য ফিরে পাও। তোমার সঙ্গে জানাশোনা হ'য়ে বড় সুখী হ'লাম বাবা। তোমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তাঁর স্বনামধন্য যশের কথা আমার কাছে অজ্ঞাত নয়। তিনি যখন এ জেলায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হ'য়ে প্রথম আসেন, তখন আমরা স্কুলে পড়ি। চোখের দেখা না থাকলেও, তাঁর নাম ও খ্যাতির সঙ্গে এখানকার অনেক লোকেরই যথেষ্ট পরিচয় আছে। দেখতে বুড়ো হ'লেও, বয়সে এখনও তেমন বুড়ো হইনি বাবা! দারিদ্র্যের দুঃসহ করাঘাতের তাড়নায় মেরুদণ্ড নুয়ে প'ড়েছে—আর এই হতভাগিনী কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে, তাকে যোগ্য বয়সেও পাত্রস্থা ক'র্‌তে না পেরে, চিন্তায় এ চুলগুলোতেও সাদা রঙ ধরে গেছে। নইলে বুড়ো আমি নই। এখনও তৃণগাছটি ধ'র্‌তে পেলে এ অকূল পাথার বেয়ে কিনারায় আসতে পারি। কিন্তু কি ক'রবো? বিদ্বান্ না হ'লেও আমার মত সামান্য ইংরাজী লেখাপড়া জানা লোকেও নানা রকমে যথেষ্ট উপার্জ্জন করে, ক'র্‌চে; শুধু আমিই কৃত পাপের ফল ভুগতে, মা হারা কন্যাটিকে বুকে ধ'রে এই ভাঙ্গা কুঁড়েতে শুয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্চি।"

"চেষ্টা ক'রে একটা কাজ কর্ম্ম না হয়—"

"অনেক ক'রেচি বাবা। ছোট হ'তে বড় পর্য্যন্ত যাকে সামনে পেয়েচি, ক্ষমতা থাক্ না থাক—সকলের পায়ের তলায়

আমার এ অকালশুভ্র মাথাটা নীচু ক'রতে বাকি রাখিনি। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত পাইনি ত কিছু। রোগের দারুণ আক্রমণে যে দিন দীর্ঘ দশ বছরের চাকরীটি ছেড়ে এই ভিটেয় এসে ব'সলাম, তখন আমার সঞ্চিত অর্থ কোটী অর্ব্বুদে না দাঁড়ালেও নিতান্ত কম ছিল না। তারই জোরে, এই ক্ষুদ্র গ্রামে ব'সে, এখানকার অধিবাসীদের আদর আপ্যায়নে দিন আমার বড় সুখেই কাটছিল। তারপর এখান থেকেই আমার সুখ দুঃখের সাথীটিকে স্বর্গে পাঠালাম আর মায়ের অভাবে কচি পাঁচ বছরের ছেলেটা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিল ব'লে তাকেও তার মায়ের কোলে তুলে দিলাম। এখন চঞ্চলা কমলাকে হারিয়ে মাতৃহীন কন্যাকে নিয়ে—এই ভাঙা হাটে ব'সে, পরস্পরের আকুল চোখের পানে তাকিয়ে, কোনদিন আধপেটা, কোন দিন বা কিছুই না, এমনিভাবে দিন আমার কাটচে। আমার দিন ত ঘনিয়ে এসেচে বাবা, এত অত্যাচারে দেহ আর কদিন টেকে? কিন্তু মেয়েটার দিকে তাকালে আমি সামলাতে পারিনে। না খেতে পেয়েও হতভাগীর যে কেমন ক'রে অমন ভুবনভরা রূপের আলো দিন দিন কোত্থেকে ফুটে উঠচে, তা তিনিই শুধু জানেন—যিনি নিজের হাতেই এ বাতিটি জেলে দিয়েছিলেন একদিন।

"লোকের তোষামোদ করা ব্যবসা অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি বাবা। যে দিন আমার সঞ্চিত ধনের সর্ব্বশেষ কপর্দ্দকটি ফুরিয়ে

গেল, সেদিন এই গ্রামেরই লোকদের কাছে—যারা আমায় মহা-মান্য জমিদার বাবুদের চেয়ে কিছু কম খাতির ক'রত না, তাদের কাছেই পেলাম কি জান? অবজ্ঞা—তাচ্ছিল্য—আর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া টিট্‌কারী! তবু সহ্য ক'রে আছি—কোথাও যাইনি এখান থেকে, যেতে পারিনি। যেখানে যে তুলসীমঞ্চের তলায় সোনার প্রতিমাকে স্বর্গের পথে পাঠিয়ে দিয়েছি, যে ক্ষুদ্র অঙ্গনের ওপর মা মা ক'রে আছাড় খেয়ে কেঁদে কেঁদে আধফোটা কুন্দ কুসুমটিকে অসময়ে শুকিয়ে যেতে দেখেছি, সেই হাজার সুখ-দুঃখের মরমছেঁড়া স্মৃতি দিয়ে জড়ানো এ জায়গাটুকু ছেড়ে আমার কোথাও যেতে সাধ্য হয়নি, ক্ষমতায় কুলিয়ে ওঠেনি। তাই আজও বুকের রক্ত খাইয়ে মানুষ করা এই অভাগীকে ঘোষবাবুর বাগানের মালীর হাতে মা'র খেতে দেখেও আমি হাসচি। চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে এসে এ তপ্ত গণ্ডদুটোকে ভিজিয়ে দিচ্চে না—তবু প'ড়ে আছি, শুধু সেই হারান দিনের কথা যত বুকে পুষে রেখে; বড় সাধের বিছানা বিছিয়ে, খোলা জানলার নীচে মাথা রেখে সদ্য ফোটা বন-ফুলের গন্ধভরা ঝিরঝিরে মলয়-বাতাস গায়ে মেখে আধঘুমে ভোরের বেলায় যে স্বপন দেখে-ছিলাম তা আজও ভুলে যাওয়া হয়নি ব'লে।"

আমারই জন্যে সকাল বেলাকার ওষুধ আর খাবার হাতে ক'রে মেয়েকে আস্‌তে দেখে এই সংযত পুরুষটি তাঁর দুঃখের

কাহিনী ছেড়ে. অত্যন্ত সহজ সরলভাবে আমার সঙ্গে অন্য আলাপে যোগ দিলেন।

উমা (এই বালিকার নাম) অতি যত্নে আমার কতদিনের জানাশোনা লোকের মতই দিব্য পরিপাটি ক'রে সব গুছিয়ে দিয়ে ব'ল্লে, "খেয়েই এই ফল ক'খানা খেতে হবে, নিন্ ঢুক্ ক'রে।"

আমি আর না হেসে থাক্‌তে পারলাম না। তার কথা মত ঢুক ক'রেই ওষুধটা গিলে ফেলে, দু'একখানা ফল মুখে পুরে ব'ল্লাম, "তুমি যে আমায় রোজ রোজ ওষুধ দেওয়ার মত ক'রেই সব গুছিয়ে দিলে উমা! মাসীমার কাছে শুনে এরই মধ্যে শিখলে কি ক'রে?"

বালিকা সলজ্জ চাহনি দিয়ে আমার সমস্ত দেহটাকে যেন মোহের আবেশে জড়িয়ে দিলে। খেতে খেতে ব'ল্লাম "হাঁ দেখ উমা, তোমার বাবা বল্'ছিলেন তুমি নাকি খুব ভাল রান্না শিখেচ; আজ আর আমি মাসীমার হাতে খাব না—হাঁড়িতে আমারও চারটি চাল বেশী নিও।"

"না না সে হবে কি ক'রে? মোটা চালের ভাত খেয়ে ত আপনি হজম ক'র্‌তে পার্‌বেন না। আর তা ছাড়া—"

"তরকারিও নাই কি দিয়ে খাব, এই ত? সে আমি এক্ষুণি ঠিক ক'রে নিচ্ছি! মোটা চাল খেয়ে অসুখ ক'র্‌বে না আমার,

তেমন আর রোগা নেই এখন! আর যদিই বা কিছু হয়—তুমি না হয় দু'দিন সেবা ক'রে ওষুধ পথ্যি দিয়ে এসো, তা হ'লেই মিটে যাবে, কি বল? এখন আমি যাই। আমার দু'পুরের খাবার যা—গিয়েই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি কিচ্ছু ভেব না।"

উমা কিছু না ব'লতেই আমি উঠে পড়্লাম। একবার সাক্ষাতে চকিতের দেখার মতই দেখে, মন প্রাণ সব সেই দরিদ্রের ক্ষুদ্র বাড়ীর মধ্যে বিলিয়ে দিয়েই উঠে পড়্লাম। আসবার সময় জগৎসিংহের শৈলেশ্বর মন্দিরের বদলে সেই পবিত্র তুলসী-মঞ্চটির পানে তাকাতে আমার ভুল হ'ল না। তিলোত্তমাকে লাভ ক'রতে না পার্‌লে বুঝি আমার অন্য কোন সুখের আশা নেই, এ চিন্তাও যে তখন মনের ভেতর এসেছিল, তার সাক্ষী অন্য কেউ নেই;--আছেন শুধু তিনি—অন্তর্যামী যিনি।

(৫)

কদিন ধ'রেই অন্য কোথাও বড় একটা যাওয়া হয় না। সকালবেলা বেড়িয়ে এসে উমাদের বাড়ী যাই, গল্প করি, আবার বিকেলেও সেখানেই আড্ডা হয়। উমার পিতা অমরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দুঃখের কথা সেদিন মাসীমার মুখে আগাগোড়া সব শুনে, মনটা বড়ই মুশ্‌ড়ে গেল। বাড়ী গিয়েই বাবাকে ব'লে এর যা হয় একটা কিছু সামান্য উপকার ক'রতেই হবে।

আহা! বেচারা কুটীল সংসারে অনেক ঘাই সহ্য ক'রেচে। যদি শেষ বয়সে একটুও স্থখের মুখ দেখতে পায়। তারপর আবার মেয়ের বিয়ে আছে।

শরীরটা এতই বেশী শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সেরে উঠতে লাগল যে শেষ পর্য্যন্ত আমায় ভাবিয়ে দিলে। পূর্ব্বের স্বাস্থ্য ফিরে পেলে আবার বাড়ী যেতে হবে; আনন্দের বদলে মনের ভেতর কি জানি কেমন কাঁদ কাঁদ ভাবটাই জেগে উঠ্‌তে লাগল যেন।

জানি না কোন্ সে পরম দয়াল বিধাতার মধুর অভিশাপে আমি ম্যালেরিয়ার আক্রমণে প'ড়েছিলাম; আজ না তারই কল্যাণে এ শূন্য বুকের মধ্যে উমার মত নিখুঁত স্থন্দরী; তার প্রেমের সিংহাসন পেতে ব'সেচে—আমার এ রোগজর্জ্জর দেহ-টাকে নিমেষে যেন এক উজ্জল সোনার কাঠির পুলক স্পর্শন দিয়ে কত দীর্ঘ দিনের সুপ্তির নেশাটাই না কাটিয়ে দিয়েছে।

অমরবাবুর জন্য একটা কাজ কর্ম্মের যোগাড় ক'রে দিতে এইখান থেকেই বাবাকে এক অনুরোধ পত্র দিয়েছিলাম, আজ তার জবাব এসেচে; বাবা লিখেচেন ২০।২৫ দিনের ভেতরেই তিনি যেমন ক'রে হোক্ যোগাড় ক'রে দেবেনই, আবার তারই মধ্যে আমাকেও যত শীঘ্র সম্ভব বাড়ী ফিরে যেতে আদেশ ক'রেচেন। কেননা, মেডিকেল কলেজে আমাকে ডাক্তারী পড়তে যেতে হবে। সেখানে ভর্ত্তি হবারও সময় আমার হ'য়ে এল ব'লে।

দুপুর বেলায় খাওয়া শেষ ক'রে আমার নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘর-খানির মধ্যে বিছানায় ব'সে চিঠিখানা নাড়াচাড়া ক'রছি আর এখান থেকে যাওয়ার কথাটাই ভাবচি, এমনি সময় রাজ্যের স্নিগ্ধ মাধুরি ছড়িয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে উমা সেখানে এসে দাঁড়াল। এমনি সময় রোজই সে একবার ক'রে আসে। আমার ঘর গুছিয়ে দেওয়া, খুঁটি নাটি দরকার যা, তা সময়মত হাতের কাছে ঠিক ক'রে রাখা এ সমস্তর ভার আজকাল সেই চাকরদের হাত থেকে নিয়েচে।

মনের মধ্যে অনেকদিনের অনেক কথাই লুকিয়ে রেখেছি, এতদিনেও কারো কাছে তা প্রকাশ ক'রে ব'লতে পারিনি আজ বলবার দরকারও হয়নি, সারা প্রাণে যাকে চাই তাকে ত রোজই দেখি, রোজই সেই পাগলকরা অনুপম সৌন্দর্য্যের প্রতি-মাকে এই অবিশ্বাসী চোখ দুটোর সাম্‌নে দেখতে পাই, তাই এতদিন বেশ ছিলাম নিগূঢ় এ মধুর বেদনাটাকে বুকের মাঝে লুকিয়ে রেখে। কিন্তু আজ যখন আদালতের পরোয়ানার মতই সুদুর বর্দ্ধমান থেকে বাবার এ আদেশ পত্র অতর্কিতে হাতের মুঠোর ভেতর এসে পড়ল, তখন আর ত শুধু মনে মনেই এ সুখ ভোগ করবার আশাটা চেপে রাখ্‌তে পারলাম না। আমার এ বিপুল আবেগ মাখান প্রাণ যে আজও প্রকাশ্যে তাকে নিবেদন ক'রে দেওয়া হয়নি, আজও যে এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের মহান্‌ ঐশ্বর্য্য-

ভাণ্ডার হৃদয়রাণীর কাছে "ওগো! এ সব তোমারই" ব'লে সঁপে দিতে পারিনি। নীরবে উদ্দেশে সব দিয়েই এসেচ; পাইনি ত কিছু।

নিঃসঙ্কোচে হাসি দিয়ে আমায় অভিষিক্ত ক'রে উমা ব'ললে "আপনি আজ জোর ক'রে যে বড় আমড়ার টক্ খেয়েচেন? কেন এ সব অত্যাচার বলুন ত? ভুগতে কি আর সবাই ভুগবে? খালি খালি সক্কোলকে কষ্ট দেওয়া কেন আপনার?"

ভগবান রক্ষা করুন তাও কি কখনও হয়! আমি কি কখনও ভুল ক'রে ভ্রান্ত আশা নিয়ে যার তার উদ্দেশে এ অর্ঘ সাজাতে পারি! উমার তিরস্কার শুনে আমার সমস্ত বুকখানা মধুর উত্তেজনায় ভ'রে গেল। এতদিন এত বড় অধিকারের ভঙ্গী নিয়ে সে কোন কথা আমায় বলেনি। আমি ব'ললাম "আমার অসুখ হ'লে কি তোমার কষ্ট হবে উমা?"

"না তা কেন, চব্বিশঘণ্টা রাবড়ী খেতে সাধ যায়। কি যে বলেন তার ঠিক ঠিকানা নেই।"

"আচ্ছা আর অত্যাচার করব না। এই দেখ, বাবার চিঠি, আমিত শীগগীরই দেশে যাচ্চি। এবার ডাক্তার হব কিনা, তাই কলেজে ভর্ত্তি হবার সময় হ'য়ে এসেচে, আর না গেলেই নয়। তোমার বাবারও যা হয় একটা কাজ কর্ম্মের ভাল রকম সুবিধে বিশ পঁচিশ দিনের ভেতরই হবে। তখন তোমরাও

কোন দূর দেশে চ'লে যাবে। মাঝে মাঝে আমাকে মনে ক'র্বে ত উমা! আর যদি কখনও দেখা হয় তখন এমনি রেঁধে বেড়ে খাওয়াবে ত? না কথাই ব'লবে না?"

"যাচ্ছেন যান আপনি ডাক্তার হ'তে; কিন্তু ঐ ফোড়া-কাটা শেখাই সার হবে আপনার, আর যা কিছু সব তাতেই গোল্লা। বু'দ্ধ বলে জিনিষটুকু আপনার ঘটে একেবারে 'দন্ত্য ন এ আ' বল্‌লেই হয়। যে দেশেই থাকি আর যেখানেই থাকি"—

"বল বল উমা কি! তাহলে কি আমি, সারা প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যা এতকালেও কারো কাছে প্রকাশ ক'রে উঠতে পারিনি তা—"

"আমায় কেন লজ্জা দিচ্চেন? চিরকালটা নিজের পায়ে ভর দিয়ে সংসারে দাঁড়িয়ে আছি ব'লে এমনিতেই লজ্জার মাথা খেয়ে ব'সেচি—তবু মেয়েমানুষ ব'লে যেটুকু আছে তা ঘুচিয়ে দেবেন না। আমায় আর কিছু জিজ্ঞেস ক'র্বেন না। অত্যন্ত লজ্জা-হীনার মতই আজ প্রথম আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে চল্‌লাম। যাবার দিনে একটিবার দেখা দিয়ে যেতে যেন ভুল না হয় দেখবেন।"

কি এক স্বপ্নমদিরাসিক্ত উন্মাদ কল্পনায় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশটুকু ডুবিয়ে দিয়ে ধীরা আনন্দরাণীর মতই উমা চ'লে গেল।

রেখে গেল শুধু অপূর্ব্ব মিলন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ; দোয়েল কোকিল লজ্জা দেওয়া স্নিগ্ধ মাধুরিমাময় তার প্রণয়সিক্ত কণ্ঠস্বরের রেশটুকু !

* * * *

পাঁচ ছয় দিন পরে বাবার দ্বিতীয় আদেশপত্র মাসীমার হাতে এসে পড়ায়, তিনি ট্রেন ভাড়া এবং আরও অন্য খরচখরচাবাবদ একগুচ্ছা নোট আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে ব'ললেন "আর দেরী নয় নিখিল, চাটুয্যে মশায় ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন। বাড়ী পৌঁছেই আমায় খবর দিতে ভুলিস্‌নে। আর ক'লকাতায় গিয়েও যেন হপ্তা হপ্তা চিঠি লিখ্‌তে কঁড়েমি ক'রোনা তা ব'লে দিচ্ছি।" তার পর মাসীমা একটুখানি হেসে আমার চিবুক স্পর্শ ক'রে ব'ললেন "ডাক্তারী প'ড়তে গিয়ে ক'লকাতার মেসের উড়ে বামুনের রান্না যদি তোর এ অসুখ শরীরে সহ্য না হয়—আমায় চিঠি লিখিস্ নিখিল, যার রান্না খেয়ে আর সবাইকে তুই ভুলে যাস্—সেই উমাকে সেখানে পাঠাবার আমি ভাল বন্দোবস্তই ক'রে দেব।"

বুঝলাম, মাসীমা কি ক'রে আমাদের সেদিনকার সব কথাই শুনে ফেলেছেন। আনন্দের আতিশয্যে মাসীমার পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে, চোখের জলে চারদিক ঝাপ্‌সা দেখে আমি উপুড়

হ'য়ে তাঁর পায়ের উপর প'ড়ে যেতেই তিনি আমায় কোলের কাছে টেনে নিয়ে ব'ল্লেন "ষাট ! ষাট্ !"

(গ)

তার পর পুরোপুরি চারটি বছর অতীতের কোলে ঢ'লে প'ড়েছে, আমি এখন মেডিকেল কলেজের পাশ করা একজন নামজাদা ডাক্তার। দেশে যথেষ্ট নাম ডাক হ'লেও সেখানে স্বাধীনভাবে প্র্যাক্‌টিস করিনি। বাবার ইচ্ছায় মানভূমে কোন এক বিখ্যাত কোলিয়ারীর প্রকাণ্ড হাঁসপাতালের দায়িত্ব নিয়ে প্রায় ৮।৯ মাস চাকরী ক'র্‌চি। মা বাবা দেশে আছেন।

এখানে যে চারধারে লতা পাতা ফলফুলে ঘেরা—অতি সুন্দর বাংলোখানি পেয়েছি তার দখল শুধু একা আমারই। জীবনে অনেক রকমের রঙীন আশা নিয়ে সংসারে এসেছিলাম- এখন সব যেন কাল হ'য়ে গেছে। বুকের মাঝে যে শারদ জ্যোচ্ছনার স্নিগ্ধ আলো ছড়ানো ছিল তা অনেক দিন আঁধারে ঢেকে গেছে। এ দুর্ভেদ্য নিবিড় আঁধারে ভরা অভিশপ্ত জীবন-আকাশের তলে আছে শুধু পাঁজর ভাঙ্গা চিন্তার রাশি, আর তা পুচ্ছবিস্তারি ধূমকেতুর মতই প্রলয়ঙ্কর।

শুষ্ক কঙ্কালসার রোগ জর্জ্জর দেহ নিয়ে যে দিন প্রথম উমাকে দেখে হৃদয়ের কোমল তন্ত্রী সাহানার তানে কেঁপে বেজে উঠেছিল,

সে দিনের কথা মনে হ'লে আজ এ চব্বিশ বছরের কণ্ঠ দেহটাকে আর ধ'রে রাখ্‌তে ইচ্ছা করেনা। আজ কোথায় সে হৃদিবাঞ্ছিত মোহিনী প্রতিমার সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের মিলন, আর কোথায়ই বা সেই ললিতছন্দে প্রাণভরা পাগলকরা স্বপনের গান।

চোখের জলে হাজার দরিয়া তৈরী ক'রে এই যে দীর্ঘকাল কাটিয়েছি, এই কষ্টের দিনগুলির আগে ঠিক চার বছর পূর্ব্বের এমনি এক ধূসর সন্ধ্যায় বাড়ীতে ব'সে মাসীমার লেখা মায়ের নামের চিঠিখানি সে দিন খুলে প'ড়েছিলাম সে দিন কে জান্‌তো যে আমার এ দগ্ধ অদৃষ্টটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমারই হাতে এমনি ক'রে দগ্ধ হ'য়ে যাবে। হাস্‌তে হাস্‌তে সাধ ক'রে, ভবিষ্যৎ না বুঝে আমি যে কি ভাবে নিজের মুখে সে দিন লজ্জার তামসী যবনিকাটা টেনে দিয়েছিলাম তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি। এক মুহূর্ত্তের সেই ক্ষুদ্র ত্রুটী যা এত বৃহৎ হ'য়ে দাঁড়াবে যার সংশোধন জীবন ভোর হ'তে পারবে না—তা স্বপ্নের কল্পনাতে কোনদিন আঁকতে পারিনি।

মাসীমা লিখেছিলেন—আমার বাবার দয়াতে অমরনাথ মুখুয্যে যে চাকরীটুকু পেয়েছেন তার জন্য তাঁকে অতি শীঘ্রই বিদেশে যেতে হবে। যদি সম্ভব হয় তা হ'লে যাবার আগেই তিনি উমাকে আমার হাতে সমর্পণ ক'রে যাবেন। এমনটি হ'লে তাঁর জীবনে

আর কোন কষ্টই থাকবে না। মা, যাতে আমি ক'ল্‌কাতা যাবার পূর্ব্বেই উমাকে বধূরূপে ঘরে আনেন, তার জন্যে মাসীমা খুবই অনুরোধ ক'রে লিখেছিলেন ; আর মাসীমার পচ্ছন্দ মতই যে এ বিয়ে হ'চ্ছে, বাবার বা মায়ের কোন ওজর আপত্তিই যে তিনি কানে তুলবেন না সে কথাও জানাতে কুসুর করেন নি। কিন্তু হ'লে কি হবে? আমি যে নিজের ঘরেই নিজে আগুণ ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম। স্বখাত-সলিলে যে আমিই ডুবে মরেছি, দোষ ত কারও নয়।

অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে উমার বাবা যে উমাকে নিয়ে কোন দূরদেশ চাকরী করতে যাবেন, মাত্র সেইটুকু জানবার কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরেই সে চিটিখানা খুলে ফেলেছিলাম। আগেতে জানিনি যে বাঞ্ছিতকে হাতে পাবার ঠিকঠাক ক'রেই মাসীমা এমন ভাবে চিঠি লিখেছেন! আনন্দে আপনা ভুলে চিঠি মার হাতে দিবার জন্য পা বাড়াতেই উৎকট লজ্জা এসে যেন পা দুটোকে অবশ করে দিলে। তাইত কেন আগে খুলে ফেল্‌লাম? এ খোলা চিঠি মায়ের হাতে কেমন ক'রে দেব? মা কি ভাব্‌বেন? এই সব নানা লজ্জায় আর আমি এগিয়ে যেতে পার্‌লাম না। মাসীমা যে আমাদের প্রেমের অভিনয়ের দৃশ্যপট-গুলি একটির পর একটি ক'রে নিপুণ হাতে চিঠিতে এঁকে দিয়েছিলেন।

সুখের আশা-কল্পনায়-ভরা নন্দন বনের সুরভিসিক্ত পারিজাত-হার কণ্ঠে না উঠ্‌তেই আমি ছিঁড়ে ফেল্‌লাম। নিমিত্তের ভাগী শুধু আমার লজ্জা। তবু আশা রইল আবার চিঠি আস্‌বে। কোন জবাব না পেলে আবার পত্র লিখবেনই।

কিন্তু প্রতীক্ষার অবসর আর অদৃষ্টে মিল্‌ল না। তার পরের দিনেই আমাকে তল্পী তল্পা নিয়ে ফোড়াকাটা শিখতে কলকাতায় রওনা হ'তে হ'ল। পরে শুনলাম্‌ মাসীমা আবার পত্র দেওয়াতে মা বাবা জানিয়েছিলেন—আমি যখন ক'লকাতায় চ'লেই এসেচি তখন আর এত অল্প সময়ের মধ্যে বিয়ে হওয়া অসম্ভব। কিছু-দিন পরে যা হয় হবে, মূলে বাবার ইচ্ছা শেষ পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আমার শুভ কাজটা হ'তে দেবেন না; কাজেই উমার বাবা উমাকে নিয়ে রওনা হ'য়েছিলেন—হায়! দুর্ভাগ্য আমার, সে আর কোথাও নয়, আজ আমি যে দেশে ব'সে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটাচ্চি, এই দেশেরই অত্যন্ত কাছে আর একটা কয়লার খনিতে। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! তবু আজ সে দেশে থেকেও সেখানকার অণুপরমাণুটীর সঙ্গে আলাপ ক'রেও পবিত্র, শান্ত, উদার সে বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পাইনি। অনেক অনু-সন্ধানের ফলে যা জানতে পেরেচি তা বড় হৃদয় ভাঙ্গা বড় মর্ম্মদাহী—তিন বৎসর যশের সঙ্গে চাকরী ক'রে অমরনাথ বাবু ইহলোক ছেড়ে চ'লে গেছেন। নীরস কয়লার খনিতে তাঁর সব

শেষ হ'য়ে গেছে, এ জীবনের যত সাধ আহ্লাদ তাঁর সাথের সাথী হ'য়ে কোন্ সে এক অজানা দেশে উধাও হ'য়ে গেছে, অনন্ত দুঃখের স্মৃতি বুকে ধরে কাঁদবারও আর কেউ নেই। মেয়েটিও সেই দারুণ সংক্রামক ব্যাধির হাতে পড়েই পিতার সঙ্গে মা ভাইকে দেখবার লোভ সামলাতে না পেরে পালিয়ে গেছে।

এই সংবাদ পেয়েও আমি বেঁচে আছি। চাকরী ক'রচি, চিনির বলদের মতন কাটাতেই হবে এ জীবন ব'য়ে ব'য়ে, মা বাবাকে সন্তুষ্ট করা, তাঁদের সব আদেশ মেনে চলা ছাড়া অন্য উন্নতির আশা এ মনে যে দিন আসবে পরমেশ্বর! সেই দিনই বজ্র বেদনে জানিয়ে দিও তুমি যে—উমাকে আমি কখনও ভাল বাসিনি, বাস্‌তে শিখিনি। সে আমার এ জীবনের কেউ ছিল না।

প্রতিদিন রোগ ঘেঁটে রোগীর শুশ্রূষা ক'রে সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর একটা অস্ফুট তৃপ্তির আভা আমার এ পাণ্ডুর মুখখানায় ছড়িয়ে পড়ে। নির্জ্জন ঘরে যখন আসি তখন আর দিনের আলো থাকেনা। জাগ্রতে চিন্তা স্বপ্নে ধ্যান করি আমি যে মুর্ত্তিখানি—সেইই তখন আস্তে আস্তে স্বর্গের আলো মেখে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। মনের সঙ্গে তাকে নিয়ে কত আদর করি, ভালবাসার পবিত্র আধ-ফোটা হৃদয়

সরসীর শুভ্র সরসিজ দিয়ে তার আরাধনা করি। নিরাশাভরা বুকখানা দুফাঁক ক'রে দেখাই সে পাষাণীকে। উন্মাদ কান্নার বেগ সামলাতে না পেরে চীৎকার ক'রে ফুঁপিয়ে উঠে বলি, "ওগো! দীর্ণ বুকখানার দিকে চাও একবার, দেখ কি অবস্থা তুমি তার ক'রে রেখে গেছ, নিষ্ফল কান্নায় চোখের জলে বুকের ওপর দিয়ে সিন্ধুর তুরঙ্গ কল্লোল ছুটে চ'লে যায়—তবু দয়া হয় না সে পাথরের তৈরী প্রাণের। তবু আসে না সে মর্ত্ত্যের পথে নেমে—চোখের দেখা দেখে যেতে একবার এই হতাশ প্রেমিককে তার।

মাসীমা তীর্থভ্রমনে বেরিয়েছিলেন; বাড়ী ফেরবার পথে হাজার আব্দার করা তাঁর এ স্নেহের পুতুলটিকে না দেখে যেতে পারেন নি। দুদিন এখানে থেকে, আমার এ চাকরী করা যে নির্জ্জন কারাবাস ছাড়া আর কিছুই নয় সেটা বেশ বুঝতে পেরেই তিনি বরাবর আমাদের দেশের বাড়ীতে গিয়েই মাকে যে সব কথা বলেছিলেন, তার ফলে আমি আজ এক দুর্ভাবনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েচি। মা আমার তাঁর ভাবপ্রবণ হৃদয়ের ভাষায় পত্র লিখে জানিয়েছেন—ইচ্ছা ক'রে মনের সঙ্গে যে দিন আমি সম্মতি দেব সেইদিন তিনি আমাকে সংসারী হ'তে ব'লবেন, নচেৎ নয়, আর কোনদিন কোন অনুরোধ ক'রে তিনি আমাকে কাঁদাবেন না। তাঁদের দিক চেয়ে আমি যেন মন স্থির করবার বল পাই, এই তাঁর অন্তরের আশীর্ব্বাদ। ওগো বেঁচেছি,

আজ আমি বেঁচেছি, বাঁচলাম এতদিন পরে, এইবার এস তুমি ওগো! আমার ভাঙ্গা হৃদয়ের চির অধিষ্ঠাত্রীদেবি! এস তুমি আমার এ বুকের মাঝে, এস তুমি সেই প্রথম দেখার দিনটির মত তেমনি রঙিন সাজে সেজে, এই অন্তরে অন্তরতম প্রদেশের মাঝখানে। কেউ দেখবে না, কেউ শুনবে না, কেউ জানবে না; থাকবো শুধু এ কল্পনার জগতে আমরা দুটী প্রাণী; দেখবো শুধু সব সাধ পুরিয়ে আমি তোমায়, পাব শুধু প্রাণভরে—আকণ্ঠ ভরপুর ক'রে তোমার প্রণয়। তবে এস, প্রাণময়ী আমার এস! এস!

(আ)

প্রায় সপ্তাহ অতীত হ'তে চ'ল্‌লো মাসীমা আবার এখানে এসেচেন। সেই তীর্থ বেড়িয়ে ফিরে যাবার সময় দু'দিন এসে আমার কারাবাস দেখে গেছলেন, তার ফলে মনে এমন বেদনা পেলেন যে আর নিজের বিষয় সম্পত্তির দিকেও তিনি মন দিতে পারলেন না। স্নেহের দুর্ব্বলতা তাঁকে আবার আমার কাছেই টেনে এনেচে, ছোট বেলা থেকে সন্তানহীনা মাসীমার আদরটা সব চেয়ে বেশী পেয়ে আস্‌চি, তাই এখনও তিনি আমার এ দুখের আগুনে দগ্ধ হওয়াটা চোখে দেখে আর নিজের বাড়ীতে স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না।

দিন আমার যেমন তেমন ক'রে কেটে যেতই, কিন্তু রাত্রির দুশ্চিন্তার হাত থেকে কোন দিনই রক্ষা পাইনি, এবং পেতেও চাইনি। সে মধুর চিন্তাই যেন এ দুর্বিসহ জীবনটাকে কোন রকমে চেপে ধ'রে রেখেচে, মাসীমা প্রতিদিনই আমার সঙ্গে সমানে রাত্তির জেগে আমি যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ বাগানের লোহার বেঞ্চিটার ওপর ব'সে থাকেন। অনেক রকমের আলোচনায় আমার অন্যদিকে মন ফেরাবার চেষ্টা করেন! এমনি ক'রেই আমার চাকরী-জীবন কেটে যাচ্চে।

* * * *

জষ্টি মাসের শেষ, বর্ষা আসে আসে। তবু আজ বিকেলবেলা ঠিক কাল বোশেখীর মতই খুব ঝড়বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। সন্ধ্যা থেকে সেই যে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হ'য়েচে তার আর বিরাম নেই। মাসীমা আমার খাবার তৈরী ক'র্‌তে রান্নাঘরে গেছেন। আমি বাগানের সাম্‌নে বারান্দায় একটা আরাম কেদারায় শুয়ে হাস্‌নাহানার গন্ধে ভরপুর হ'য়ে চিন্তার পাথারে ডুবে গেছি। রাত্রি তখন দশটার কাছাকাছি—হঠাৎ আলো নিয়ে ৩।৪ জন লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে একেবারে আমার হাত ধ'রে চেয়ার থেকে টেনে তুলে—তারপর বল্‌লে "শীগগির চ'লুন বড় বিপদ।" ব্যাপার কি জান্‌বার জন্য তাদের মুখের দিকে চাইতেই

তারা আবার তেমনি ব্যস্ততার সঙ্গে ব'লে উঠল—"পরে শুন্‌বেন, অপেক্ষা ক'র্‌বার একতিলও সময় নেই। এতক্ষণ হয়ত আছে কি না। আপনি আসুন দয়া ক'রে।"

গায়ে একটা জামা দিবারও অবসর তারা আমায় দেয়নি। শুধু ষ্টেথস্কোপটি হাতে ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে খুব জোরের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতেই জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লাম, "মশাইরা ব্যাপারখানা কি ব'লুন ত সংক্ষেপে; একটুও না জেনে কোথায় যাচ্চি আঁধারে ঢিল ছুড়্‌তে আমায় তার আভাষটাও কি দেবেন না?"

"আর ডাক্তারবাবু বলেন কেন। গ্রহের ফের সব। আপনা-দেরই এখানকার খাজাঞ্চিবাবুর মেয়ের বিয়ে কিনা আজ, আমরা এসেচি সেই বিয়েতে বরযাত্রী। এখন—"

"খাজাঞ্চিবাবুর মেয়ের বি—ও নতুন যিনি এসেচেন? তিনি ত দু'দিন হ'ল এখানে এসেচেন; আমার সঙ্গে এখনও দেখা সাক্ষাৎ হয়নি বটে, তা দু'দিন আস্‌তেই মেয়ের বিয়ে—সম্বন্ধ বুঝি দেশ থেকেই হ'য়েছিল?"

"হাঁ। আগে তিনি ওখানেই চাকুরী ক'র্‌তেন, কি না। আমাদের জমীদারবাবুর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট আলাপ। তাঁরই ছেলের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বয়স্থা আর সুন্দরী মেয়ে দেখে জমীদারবাবু এই সম্বন্ধ করেছিলেন। তারপর এখানে—এই যে ডাক্তারবাবু আমরা এসে প'ড়েচি।"

বাড়ীর ভেতর ঢুকে যা দেখ্‌লাম আর যা শুন্‌লাম—সে একটা বিরাট-ব্যাপার। বিয়ের ক'নে বিষ খেয়েচে। তার নিতান্ত অনিচ্ছায় নাকি বিয়ে দেওয়া হ'চ্ছিল আগে কোন কথা না জানিয়ে এবং কাকেও কিছু না ব'লে হঠাৎ শুভকাজ আরম্ভ হবার কিছু আগেই সে আত্মহত্যা ক'রে এই বিবাহের হাত এড়াতে বিষপান ক'রেচে—তারপর প্রায় আধঘণ্টার কিছু বেশীই হবে, অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছে। আরও আশ্চর্য্য এই যে পাত্রী অজ্ঞান হবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই তাকে বিবাহের বেশে সাজিয়ে ছাঁদনাতলায় আনা হয়; এবং সেখানে এসেই সে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে। তারপর আমাকে সংবাদ দিতে লোক পাঠান হয়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে সংক্ষেপে কতকটা জেনেই, আমি ওষুধ আর কতকগুলি যন্ত্রপাতি আন্‌তে হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডারকে চিঠি দিয়ে লোক পাঠালাম; তারপর সমস্ত ভিড় সরিয়ে দিয়ে মেয়েটির কাছে ছাঁদনাতলায় গিয়ে ব'সতেই'—কিন্তু একি! একি অলৌকিক বিস্ময়কর ঘটনা; নিজে চিকিৎসক ব'লেই মূর্চ্ছার ধাক্কা সাম্‌লাতে পার্‌লাম তখনই; কিন্তু এ কাকে দেখ্‌লাম আমি? কার চিকিৎসার জন্ত কাকে বাঁচিয়ে কার হাতে তুলে দিতে আজ আমি আহূত হ'য়ে এসেচি এখানে?

প্রজাপতির পবিত্র আসনের সম্মুখে লুটিয়ে এই যে স্বর্ণ-

লজ্জিকা নিমীলিত নয়নে সেই সে পরম চরণের উদ্দেশে জীবনের শেষের দিনটী কাটিয়ে অনন্তের পথে যাত্রা ক'রতে যাচ্চে—কে সে? সেই কি? হাঁ সেই ত—আমার বুক-জুড়ান, প্রাণ আলো-করা চির-বাঞ্ছিত উমাই ত! তবে কী এ? যা শুনেছিলাম সে কি তবে—"

"নিখিল! নিখিল! আমার প্রাণের উমা যাকে আমি এতদিন বুকের রক্ত খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, যাকে চোখের আড়াল ক'রে থাকতে পারব না ব'লে তোমার মাসীমার অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে এসেছিলাম—তোমার পায়ের গোড়ায় পৌঁছে দিবার ভারটুকু তাঁর হাতে দিয়ে, অভাগীকে সেই দেবীর আশ্রয়ে রেখে আসতে পারিনি—সেই আমার সারা হৃদয়ের স্নেহমাখা উমাকে আজ বাঁচাও বাবা! ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষীণ আলোটুকু তার এই চার বৎসরকাল কোন রকমে জ্বল'ছিল হয় ত বা কোনদিনের তরে তোমার দেখা পাবে ব'লে। কিন্তু মা আমার আজ নিজের হাতে তার সব শেষ ক'রে দিতে ব'সেচে। কোন রকমেই আর যখন অভাগিনীর এতটুকু আশা তার বুকের ভেতর রইল না, যখন সে তোমারই উদ্দেশে নিবেদন করা দেহটা অন্যের হাতে দিতে চাইলে না, তখন কোনদিকে কোন পথ না খুঁজে পেয়ে অভাগিনী সব শেষের পথই বেছে নিয়েচে। তাকে ফিরিয়ে আনো

বাবা! যদি ক্ষমতা কু'লোয়, তাকে ডেকে নিয়ে নিজের পায়ের গোড়ায় জায়গা দাও।"

"আগে যদি বুঝতাম হতভাগী তোমাকেই পরম গুরুর আসনে বসিয়ে মনে মনে পূজা করে, তাহ'লে একটী দিনের তরেও তাকে অন্তের হাতে তুলে দিবার কল্পনা আমি মনেও আন্‌তাম না। কি ব'ল্‌বো বাবা নিখিল। আজ আমারই দোষে এ দক্ষযজ্ঞ আমারই অদৃষ্টের তাড়নায় আজ সতীর দেহত্যাগ।"

"আপনাদের খুঁজতে আমি ত কোথাও বাকি রাখিনি! অনেকদিনের অনুসন্ধানের ফলে মিথ্যা সংবাদ পেয়েছিলাম— আপনারা পিতা পুত্রীতে ইহলোক ছেড়ে চ'লে গেছেন। সেই থেকে পাঁজর ভাঙ্গা হা হুতাশ আমার জীবনের সার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, দিনের শেষ থেকে রাত্রির শেষ পর্য্যন্ত এই স্বর্ণ-লতাকে দেখ্‌তে পাব ব'লে ভগবানের কাছে মরণ কামনা করা ভিন্ন আমার আর অন্য চিন্তা ছিল না।"

ততক্ষণ উপযোগী ওষুধ ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে উমার জীবন-শক্তি ধীরে ধীরে ফিরে আস্‌চে। মাসীমাকে ডাকতে পাঠিয়ে আমি তার ক্ষীণ দেহটুকুর পানে তাকিয়ে ব'সে আছি। চিকিৎসার যোগ্যতা তখন কোথায় উড়ে গেছে।

সেই ছাঁদনাতলাতেই বিবাহের বেশে সজ্জিতা মৃত্যুলোক

ঘেরা বাংলো খানিতেই একলা রেখে এসেচি ; তাঁর ত আর যেমন তেমন কাজ নয়, অতগুলি লোকের প্রাণের হেফাজৎ করতে হয় নিজের হাতে ; তিনি সে মহাকর্ত্তব্য ছেড়ে কেমন ক'রেই বা আসেন ? আমার বরাবর এই সান্ত্বনাটুকুই ছিল, আর এখনও তাই আছে বটে, তবে পোড়া প্রাণটা যে মানে না ; মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হ'য়ে আকুল বাহু বাড়িয়ে যেন তাঁকে আমার বুকের মাঝখানটিতে টেনে আনতে চায়।

কেউ কখনও শুনেচে কি না জানি না, আর কারও ডাক্তার বাবু বউকে দিনে দুখানা (সকালে বিকালে) চিঠি লেখে কি ? আজ উনিশ দুগুণে আটত্রিশ খানা ৪ পাত ভরা চিঠি আমার ক্যাশ বাক্সের ভেতর, আবার কাল বিশ দিনে আর দুখানা এসে চল্লিশে দাঁড়াবে। তাই ভাবচি ভগবান্ ! এ প্রাণের দামটা তুমি কতই না বাড়িয়ে তুলেচ এখন।

এখানে বাবা (আমার শ্বশুর) আদর ক'রে শুধুই বলেন মা টি আমার যেন আনন্দরাণী। আনন্দরাণী নাম নিয়ে ত আর নিরানন্দ ভাবটা কারও সামনে দেখান যায় না, তাই সব সময় হাসি খুসি আমোদ তামাসা নিয়েই কাটিয়ে দিই সব দিনগুলিকে। তার পর ভাববার, বিরহিণী হ'য়ে গালে হাত দিবার ঢের সময় ত রাত্তিরের বেলা ঠিক হ'য়ে আছেই। কিন্তু থাক্ সে সব কথা—

সকালবেলাকার কাজ শেষ ক'রে ডাক্তার বাবুর ৮ টার ডাকের চিঠিখানা লিখে খামের ওপর নামটি ফেঁদে শ্রীশ্রীচরণেষু যেই শেষ ক'রেচি—অমনি দেখিনা বাবা—একখানা টেলিগ্রাফ হাতে ক'রে আমারই ঘরে হাজির! লজ্জায় কোন্‌দিক সামলাই তার ঠিকানা নেই; একে টেলিগ্রাফ, ও ত খারাপ খপরই আনে জানি; তায় স্বামীর চিঠি হাতে—সামনে দাঁড়িয়ে শ্বশুর, চিঠিখানাই লুকোবো না খপরটার কথাই জানবো কিছুরই তাল সাম্‌লাতে পারিনি। এমন সময় বাবাই বল্‌লেন "এই দেখ মা, নিখিল 'তার' ক'রেচে। তার পূরো তিন মাস ছুটিই কোম্পানী মঞ্জুর ক'রেচেন, আর তার জায়গায় অস্থায়ীভাবে যে ডাক্তারটি কাজ করবেন তিনিও পৌঁছে গেছেন সেখানে।"

যাক্ বাঁচলাম 'তারের' খপরে এমন মধু মাখা কথাও ব'য়ে আন্‌তে পারে! নিজেরই অজ্ঞাতে কি জানি কেমন ধারা ক'রে লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস্ ক'রে ব'স্‌লাম—"তা হ'লে এঁরা আস্‌চেন কবে?"

"কে, নিখিল?"

এইরে, এবার হাঁ কথাটা ত আর বল্‌তে পার্‌লাম না। আপনা আপনি মাথাটা মাটির দিকে নীচু হ'য়ে গেল যে! বাবা ব'ল্‌লেন "নিখিল সে সব কথা লিখে জানাবে বোধ হ'চ্চে।

টেলিগ্রাফে সব কথা ত আর গুছিয়ে বলা চলে না। আজই বোধ হয় তোমার চিঠিতে খপরটা পেয়ে যাবে।"

আর কিছু না ব'লে আমি কি করি কি বলি তাই ভাবচি—নীচে হ'তে ছোট মা হাঁক্ দিলেন "ওলো, ও পোড়ারমুখী, বলি চিঠি লিখতে ক বছর দেরি হবে লো ?"

"যাই ছোট মা" ব'লে বাবাকে একলা রেখে বুকের ধন চিঠিখানা বুকের কাপড়েই লুকিয়ে নিয়ে সটান নীচে নেমে এসে দেখি, মোট পুঁটুলি নিয়ে এই মাত্র আমাদের কোলিয়ারীর বাসা থেকে ছোট মা এসে পৌঁছেচেন, আর মায়ের কাছে আমার চিঠি লেখার কথা শুনেই একেবারে সেই আদরের ডাক পোড়ারমুখী।

প্রণাম ক'রে কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদের পর আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম ছোটমার আর মায়ের কথাগুলো শুনতে।

মাকে ছোট মা ব'লচেন "কাল না হয় পরশু নিখিল এসে প'ড়বে। ওদিকে ধানবাদে কি একটা মেলা আছে ব'লে কাল থেকে গাড়ীতে খুব বেশী ভিড় হবে; সেইজন্যে আমাকে আজই পাঠিয়ে দিলে, তা ধীরেশ ছেলেটি খুব ভাল, পেটের ছেলের মতন আদর যত্ন করেই আমায় নিয়ে এসেচে। রাস্তায় গাড়ীতে আসার কষ্টটা যে কেমন তা মোটেই জানতে দেয়নি। ওলো উর্মি! যা বাবু বাছাকে একটু চা টা আর একটু জলখাবার ক'রে দে; সেই কাল রাত্তিরে যা

বাসায় খেয়ে এসেচে। যা মা, যদি তৈরী খাবার কিছু থাকে ত বাইরের ঘরে পাঠিয়ে দে। তারপর চায়ের জল চড়াবি। চাকরদের ব'লে দিস হাত মুখ ধোবার জল টল যেন সব ঠিক ক'রে দেয়। আর—" তাঁর কথা শেষ না হ'তেই ব'ললাম, "ধীরেশ বাবুকে আমি বোধ হয় দেখিনি, না ছোটমা?"

"ওমা তুই দেখিসনি? হাঁ হাঁ বটে, তুই যেদিন এলি সেই দিনই নিখিলের সঙ্গে ধীরেশকে চা খেতে আমাদের বাসায় আসতে দেখলাম। কিন্তু প্রায় তিন চার মাস থেকেই ও কোলিয়ারীতে চাক্‌রি করে। তুই আসার পর সে একরকম আমাদের ওখানেই নিখিলের কাছে সব সময় থাকতো। বেশ ছেলেটি। এমন আপনার ক'রে নেওয়ার গুণটুকু সবারই থাকে না। নিখিলের হাতের কাজ শেষ না হওয়াতে যেই বলা ধীরেশ যা না ভাই, মাসীমাকে রেখে আয়। অমনি ধীরেশ ব্যাগ হাতে গাড়ীর দরজায় এসে হাজির। হাঁ বন্ধু বটে। নিখিল ত ধীরেশ ব'লতে অজ্ঞান, কোথায় রাখবে কি খাওয়াবে সেই ভাবনাই তার সারাদিন· যা মা! খাবার দাবার পাঠিয়ে চা দিবি তখন। দিদি! চাটুয্যে মশায় কোথা? তাঁকেত দেখচিনে?

"বাবা ওপরে আমার ঘরে আছেন" ব'লেই এই নতুন অতিথিটির সৎকারের ভার পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার ঘরের দিকে স'রে পড়লাম।

(খ)

নিতান্ত পাপীর মন ব'লেই না অতিথি সৎকারের আয়োজন ক'রতে ব'সে আমার ময়লা মনটা খালি খালি খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল।

ছোটমার আদেশ পেয়ে ভাঁড়ার ঘরে জলখাবার সাজাতে ব'সে কেবল আমার সেই মদনমোহনটির কথাই বারে বারে মনে হ'তে লাগল। কোথায় প্রভু আমার নিজে কুঞ্জের দ্বারে এসে বাঁশীতে ফুঁ দেবেন আর আমি হাতের কাজ ফেলে ছেড়ে ছুটে তাঁকে ধরতে যাব—না এলেন কি না তার বদলে কে কোথাকার ধীরেশ না কি বাবু! আরে ম'ল ডাক্তার ত আর একজন তিন-মাস কাজ চালাতে এসেই প'ড়েচে সেখানে, তার হাতে সব কাজ বুঝিয়ে দিয়ে কি আর ছোটমার সঙ্গেই তাঁর আসা হ'ত না? সাধে আর কবি গেয়েছিলেন—"এমন নিপট নিঠুর শ্যাম নটবর" থাক্ নিঠুর হইলেও তিনি শ্যাম, আর কঠিন হ'লেও তিনি আমারই সেই নটবর, ভেবে আর কি করি বল? এখন অতিথি নারায়ণের যে খিদেয় নাড়ী চোঁ চোঁ, সেটা ত আগে ঠিক ক'রে দিই, তারপর ভাববার যা আছে সে ত আছেই রাত্তিরের বেলায়।

ভাঁড়ারে যা কিছু ছিল তাই দিয়েই একরকম ক'রে একটা

মাঝারী ডিস্ সাজিয়ে মনুয়াকে দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে আবার রান্নাঘরে ঢুকলাম কেটলি নিয়ে চায়ের জল চড়াতে। উঃ কি ভাগ্যি যে হোঁচট খেয়ে পড়িনি থালা বাসন গুলোর ওপরে, মনটা যে ছাই শুধুই উড়োতাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে, হোঁচট খাবার কি আর দোষ আছে ?

কেটলিটা উনুনে চাপিয়ে দিতেই মনুয়া ফিরে এসে ব'ললে "বাবু ত বৈঠকখানায় নেই, শুধু চাদর গায়ে দিয়েই কোথা বেরিয়েছেন।"

আমি ত অবাক্! এই শুনলাম কাল রাত্তির থেকে খাওয়া হয়নি এর মধ্যেই আবার কোথা সরে পড়লেন ? জিজ্ঞাসা করলাম "কোথায় গেছেন বলে যাননি? বাহিরে কেউ ছিল না ?"

"না ; বাহিরে ত কেউ নাই কেবল তিনিই ছিলেন। এক্ষুনি আসবেন বউদি। জুতোও পড়ে রয়েচে। দাদাবাবুর একজোড়া পুরান চটি পড়ে ছিল ওঘরে, বোধ করি সেইটে পায়ে দিয়েই—"

"আচ্ছা তুই বাইরে থাক্‌গে যা। এলেই খাবারটা আর চা নিয়ে যাবি।"

ক্ষুৎপিপাসাকাতর অতিথি নারায়ণটির যে আবার কোথায় গমন হল তা ত বুঝতে পারলাম না। যাক্ জলটা গরমই হোক; এলে তখন যা হয় হবে।

মা এসে ব'ললেন "চা দিয়েছ মা পাঠিয়ে ?"

"তিনি কোথা বেরিয়েচেন। মন্নুয়াকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে-ছিলাম, ঐ ফিরে রেখে গেছে। জল গরম হচ্ছে এলেই চা'টা ক'রে দেব অখন।"

"কিন্তু রান্না-বান্নারও একটা ভাল মন্দ যা হয় ক'রতে হবে। সেই কোন কয়লার দেশে থাকে বাছারা ; মাছ টাছ না হয়—"

"সে আমি নতুন চাকরটাকে পাঠিয়েচি মা জেলে ডাকতে। তালপুকুরে দুটো খেয়া দিলেই মাছের ভাবনা মিটে যাবে। এখন বাবুটি এলে বাঁচি যে। এদিকে আটকে থাক্‌লে ত চল্‌বে না। আবার রান্নাবান্নার জোগাড়টাও ত দেখা চাই।"

"তোমার যে মা নিজের হাতে সব কাজ না ক'রলে পছন্দ হবে না। নইলে রান্নাবান্নার লোকের ত অভাব নেই তোমার। তা ছাড়া আমিও রয়েচি।"

"মা যে কি বলে তার ঠিক নেই। আমি এত বড় জলজ্যান্ত মানুষটা দাঁড়িয়ে দেখবো আর তুমি যাবে রান্নাঘরে? আজ রান্না কর, কাল ভাঁড়ার গুছিয়ে নাও, পরশু খাবার কর—আর আমাকে আলমারীতে পুরে মোমের পুতুল সাজিয়ে রেখে দাও—চোখ দুটো জুড়িয়ে যাবে। আমারও স্বর্গ হোক্‌, পাঁচজন লোকেও বলুক আহা! বুড়ীর কি ভাগ্যি! কেমন গুণের বউই পেয়েছে!"

মা আর হাসি চেপে রাখতে না পেরে আমার মুখখানা তুলে

ধরে ব'ললেন "ওরে পাগলি! তা বলিনি। রোজ রোজ একা এত বড় সংসারটা দু হাতে ঠেললে বাঁচবি ক'দিন বল্ ত? লোহার শরীর নিয়েও যে এমন ধারা খাটুনি কেউ পেরে ওঠে না।"

"হ্যাঁ, পেরে ওঠে না আবার। ঐ একঘেয়ে কথা গুলো আর ভাল লাগে না তোমার মা! আমি বাবু সোজা বুঝি যা, তা ক'রবই। যদি তোমরা আপত্তি তোল বাবাকে ব'লে এক্ষুণি তোমাদের সঙ্গে আলাদা হ'য়ে আমরা বাপ মেয়েতে নতুন ঘর পাতবো তা ব'লে রাখচি। বাড়ীতে অতিথি এলে তারও খাওয়ানর ভার পাঁচজনে নেবে, মা বাপকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে গেলে তাতেও আপত্তি তুলবে—তবে আমায় এনেছিলে কেন?"

"আচ্ছা আচ্ছা সব তুইই করিস্। শ্বশুরকে ত গুণ করেইছ আবার শাশুড়ীকেও বাদ দিলে না মা! কোথাকার যাদু জানা লোকের বেটী গো! কথায় কাজে কিছুতে পারবার যো নেই।"

ছোট মা এসে বল্লেন, "দেখলে দিদি ছেলেটার কাণ্ডখানা? আমি কোথায় ঊর্মিকে ব'লে খাবার চা পাঠাতে ব'লে দিলাম—বেচারা রাত থেকে খায়নি ব'লে, আর সে চ'লল কোথায় না খেয়ে ডাকঘরে! এখনই নিখিলকে 'তার' করা তার চাইই, পাছে সে আবার ভাবে। ডাকঘর থেকে এইমাত্র ফিরে বাইরের

ঘরে ব'সেচে এসে, দে উর্মি! এবারে তার জলখাবারটা পাঠিয়ে; ওরে! ও—কি? কি নাম ছোঁড়ার উর্মি?"

"মঙ্গুয়া। আমি তাকে ব'লে রেখেচি সে আসবে এক্ষুণি, তোমার বাছার তরে আর ভেবে সারা হ'তে হবে না ছোট মা। তা তিনি আবার 'তার' ক'রতে গেলেন কেন? তোমাদের পৌঁছানর সংবাদ দিতে বুঝি? কেন চিঠি দিলেই ত হ'য়েযেত।"

"হুঁ, হ'ত। নিখিলের ব্যাপার ত তুই জানিস, যে বাক্যবাগীশ! রাস্তায় কোন গোলমাল হয়েচে কি না কেমন ধারা ক'রে আমরা এলাম সে খবরটা দেরিতে পেলে তার ত চলবে না। ধীরেশকে আসবার সময় পৌঁচে 'তার' ক'রতে না হবে তুশোবার ব'লে দিলে। তুইও ত পোড়ারমুখী কম ন'স। তোর রতনপুরে আসার তু মিনিট পরে টেলিগ্রাফ পাঠাতে হয় নি? ভুলে গেছিস্ সে কথা বুঝি?"

চা আর খাবারটা মঙ্গুয়াকে দিয়ে পাঠিয়ে ছোট মাকে জবাব দিলাম "না গো! ভুলিনি, পোড়ারমুখী উর্মি তোমার ভুলে যাবার মেয়ে নয়। তবে সে একটা যুগের কথা কি না? তাই কেমন ধারা গোলমাল হ'য়ে গেছলো।"

"অবাক্ করলি উর্মি! উনিশ কুড়িদিনে একযুগ হ'য়ে যায় যদি তা হ'লে কতদিনে—"

"যুগ আবার কাকে বলে ছোট মা? এই ত তোমাদের ওখান

থেকে আসাটাই আমার উনিশ দুগুনে আটত্রিশ যুগ হ'য়ে গেল। একি কম দিন?"

"নে বাবু তোর সঙ্গে ত আর কথায় পারবার যো নেই। আজকালকার মেয়েগুলোর মুখের সামনে এগোয় কার বাপের সাধ্যি। এখন তোর ঐ চাকরটাকে কি নাম ছাই মনেও থাকে না, ব'লে দিস ধীরেশের কিছু চাই টাই নাকি। নাইতে যাওয়ার কাপড় গামছা বোধ হয় সব তার ব্যাগেই আছে; তবু একবার জেনে নিস কি চাই না চাই।"

দেখলাম ছোটমার এই ধীরেশবাবুটীর ওপর ভারি টান। কোথায় রাখবেন কি খাওয়াবেন তার ঠিক ক'রে উঠতে পারছেন না। আর আমারও ত দেখাটা খুবই উচিত। যে সে লোক ত উনি নন, আমার ডাক্তার বাবুর বন্ধু। আবার যে রকম ক'রে এসেই পৌঁছানর খপর পাঠালেন—তাতে যে খুব বড়রকমের মাখামাখি ভাবসাব আছে তাও বুঝতে পারচি, অতএব আমাকে ত এর যত্ন সেবার ভার ভাল করে নিতেই হবে। আমার প্রাণ কানাইএর বন্ধু সুতরাং সুবল টুবল একটা কিছু হবেনই। এখন সুবলের পয়ে ব্রজেশ্বর আমার মাস তিনেকের মতন ব্রজে এলে যে বিরহিণী রাই-কমলিনীর প্রাণটা বুকে স্থির হ'য়ে ব'সতে পায়। বাপ! হাপানি ব'লে হাঁপানি, একেবারে প্রাণটা নিয়ে শুদ্ধ টানাটানি প'ড়েচে। ছোটমা বলেন, উনিশ কুড়িদিন—তাঁদের

আর কি, মুখের কথা ত ? ফস্ ক'রে বের ক'রে দিলেই হ'ল। যার ব্যথা সেই জানে, পরে তার কি বুঝবে বল ? এখন এই ধীরেশ বাবুটিকে নিয়ে গোল না বাধলে বাঁচি, সুবলের মতনই যদি তিনি কানাইকে নিয়ে কেবল "গোঠে আয়, গোঠে আয়" ক'রে যখন তখন ডাক ছাড়েন, তা হ'লে ত শ্রীমতীর কুঞ্জ তেমন সরগরম হ'য়ে উঠবে না।

এই দেখ, না, আমি যেন কেমন ধারাই হ'য়ে পড়লাম, এ কদিন তাও একরকমে কেটেচে এখন তাঁর আসবার কথাটা ঠিক জেনে আর কোন কাজে মন ব'সাতে পারিনে যে !

মাথার উপর বিশমন কাজের বোঝা চাপানো, আর আমি ব'সে গেলাম কি না পা ছড়িয়ে নিজের ভাবনা ভাবতে। পুরুষদের দোষ দিই নিষ্ঠুর কঠিন ব'লে ; কিন্তু আমরাও স্বার্থপর বড় কম নই, যাক আর ভাবতে পারিনে বাবু ; আঁচলে যখন বাঁধবো তখন বাঁধবো ; এখন ত খালি আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে কাজে লেগে যাই। বেলাও বড় কম হয়নি কখন যে কি হবে ভেবে পাইনে। বাড়ীতে স্বামীর পরমবন্ধু অতিথি হ'য়ে এসেচেন, এখন নিজের কথা ভাবতে গেলে ত চ'লবে না। পুরুষ কাজ নিয়েই আছে, তাদের ত কাজ ক'রতেই হবে। নিজের সুখ ভেবে, সে কর্ত্তব্যে বাধা কেন দিতে যাব ?

রাজপুতের মেয়েরা শুনেচি, নিজের হাতে সাজিয়ে স্বামীকে

যুদ্ধ করতে পাঠাত। এমনি ধারা সুখের কামনা মনে এলে কি আজ ইতিহাসের পাতায় পাতায়, তাদের নামগুলো এমন ঝকঝকে টকটকে লোকের চোকের সামনে জ্বলত, না ঘরে বাইরে যাত্রা থিয়েটারে তাদের কথা এমনি করে সবাই মুখে মুখে গেয়ে বেড়াত, না বায়স্কোপেই এমন তারিফ করা ছবির দল নড়ে চড়ে বেড়াতে পেত!

আমিও ত মেয়ে মানুষ। কাজের ভিড়ে স্বামী যদি দুদিন বাড়ী আসতে নাই পেলেন, কেন মিছে ভেবে সারা হব! তাঁর হাতে কত লোকের জীবন মরণ নির্ভর করে জেনেও, কেন আমি সে কথা নিজের সুখ চেয়ে ভুলে যাব? আমার ধন সে ত আমারই আছে। কিন্তু না! যাক্—তবু ছাই—

সকাল বেলায় বিছানা ছেড়েই একটা আশ্চর্য্য জিনিষ দেখবার লোভ সামলাতে না পেরে তাড়াতাড়ি ছাদে গিয়ে পশ্চিম দিকে তাকিয়েই হতাশ হয়ে বসে পড়লাম সেখানে। দোতলার সিঁড়ির ছাদের আলসেটা না থাকলে হয় ত বা পড়েই যেতাম।

(গ)

অনেকক্ষণ বসে থেকেও সকালবেলাকার পূবের সূর্য্যিটা পশ্চিমে দেখতে পেলাম না। আমি ঠিক জানতাম এ আশ্চর্য্য

ঘটনাটা আজকে আমার চোখে পড়বেই—তার কারণও বুঝতে এতটুকু বাকি ছিল না। কাল ডাক্তার বাবুর রোজকার সনাতন নিয়মমত দুখানার জায়গায় একখানা চিঠিও যখন পেলাম না, তখনই মনে আমার আশা জেগে'ছিল যে বড রকমের এ মজাটা আজ দেখা যাবেই। সকালবেলায় পশ্চিমদিকে সূর্য্যি ওঠা দেখতে তাই ছাদের ওপর এলাম। আজ এই পাঁচ বছরের ভেতর ছাড়াছাড়ি আমাদের খুব কমই হয়েচে; মাঝে মাঝে ২।১ দিন বতনপুরে আস্তাম, তখনও এমনি দিনে দুখানা ক'রে চিঠি; এবার ত কথাই নাই—কিন্তু কাল থেকে হ'ল কি?

এখন যাই, বাবার চাটা না হয় দেরিতে দিলে ক্ষতি হবে না, কিন্তু ধীরেশ বাবু শুনেচি খুব সকালেই খান; তাঁরটা আগে তৈরী ক'রে পাঠাই।

কিন্তু মনুয়াকে ডাকতেই সে এসে ব'ল্লে "আজ আর চাএর দরকার নেই বউদি! ধীরেশবাবু বর্দ্ধমানে চ'লে গেছেন। আসবার কথা কিছু বলে জাননি।"

হাঁ, দেখতে না পেলেও একটা আশ্চর্য্য রকম কিছু শুনলাম বটে। বাবুটি কাল যখন এলেন, তখনই তাঁর খাবার দাবার পাঠাতেই প্রথমে সেটা ফিরে এল; তারপর আজ আবার শুনচি না ব'লে ক'য়েই পাখী ফুড়ুৎ ক'রে উধাও হ'য়েচেন। এদিকে মা ছোটমা ত বাছা আমার গোপাল আমার, কয়লার দেশের

ভাল জিনিস না খেতে পাওয়া সাতরাজার ধন সাগর ছেঁচা মানিক ধীরেশ আমার ক'রে পাগলের বাড়া হ'য়ে প'ড়েচেন; কিন্তু মানিক যে আবার কোন সাগরের পানে ছুটে চ'ল্লেন তাও ব'লে গেলেন না। বাড়ীতে এত লোকজন থাক্‌তে জানিয়ে যাওয়ার লোক হ'ল কি না তাঁর মনুয়া! একটা পনর বছরের দুধের বালক! ডাক্তারবাবুর মনটির সঙ্গে এর মনের যে কোন-খানটায় কেমন ভাবে যোগাযোগ আছে, তা আমি কিছুতে ভেবে পাইনে; ডাক্তার বাবুর এ দীর্ঘ ছ সাত বছরের উমারাণী হয়েও না।

কি রকমের ভদ্রলোক? বাড়ীর ভেতর বল্‌বার এত লোক থাক্‌তে চাকরকে ব'লে গেলেন শুধু দুটি কথা "বর্দ্ধমানে চল্লাম" টেলিগ্রাফের খবর চাইতেও এঁর মুখের কথার দেখ্‌চি দাম ঢের বেশী বেশী। তা আবার বর্দ্ধমান থেকেই আস্‌বেন না সেখান থেকেই আর কোন গোলকধামে রওনা হবেন সে খবর-টাও দৈবজ্ঞ ডাকিয়ে জান্‌তে হবে। কবিতা টবিতা লেখেন কিনা তাও ত জানিনে। না লিখুন ভাব রাজ্য নিয়েই আছেন নিশ্চয়; নইলে হাতব্যাগটা কখনো কোন ভদ্রলোক কোথাও যেতে হ'লে এমনি ক'রে ফেলে রেখে যায়? নতুন জায়গায় এসে কোথায় গ্রামখানা দেখে শুনে বেড়াবেন, তা না, সারা বিকেল থেকে রাত দশটা কেটে গেল ঠায় ব'সে বাগানের

লোহার বেঞ্চিটার ওপর! বাবা কতবার ডাকলেন বেড়াতে যাবার জন্যে—একবার কি বাবু ন'ড়লো সে আসনটা ছেড়ে! চোখ দুটো দিয়ে আকাশটাকে গিলে খায় আর কি, যেন কতবড় দর্শনতত্ত্বের আলোচনাতেই ডুবে গেছেন।

যাক্ ছোটমাকে এ খবরটা না দিলে ত চলেনা দেখ্‌চি। আমার একার কল্পনা জল্পনায় কিছু ঠিক হচ্চে না। আহা! বাছা আমার, ধীরেশ আমার ক'রে অজ্ঞান হ'য়ে আছেন কাল থেকে দু'বোনে, একবার বাছার শিকলি ছেঁড়ার খবরটা দিয়ে দেখি—প্রাণটা কেমন ধারা ক'রে হা হুতাশ করে তাঁদের।

আমাকে আর কষ্ট ক'রে যেতে হ'ল না ছোটমা নিজেই এসে রান্নাঘরের দরজার দাঁড়িয়ে দুহাতে দুখানা কপাট ধ'রে অবাক্ হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে ব'ল্লেন "দিন দিন এ হ'চ্চে কি তোর উর্মি? সকাল থেকে ব'সে ব'সে উনুনের ছাই ঘাঁটচিস্—এ'দকে কত বেলা হ'ল তার হুঁস আছে? চাটুয্যে মশায়কে না হয় এর পরে দিলে চ'ল্‌বে কিন্তু ধীরেশের যে তিন সকালে চা না হলে চলে না সে ত কালই দুশোবার তোকে ব'ল্লাম। কি ধিঙ্গীই হ'লি! বুদ্ধি বিবেচনা ঘটে একরত্তিও যদি থাকে।"

কি অপূর্ব্ব স্নেহ ভালবাসায় মাখানো প্রাণ আমার ছোটমার। নিজের ছেলেটির বন্ধু ব'লে সেও আজ যেন তাঁরই বত্রিশ নাড়ী

ছেঁড়া পেটের ছেলের চাইতেও বেশী। এ স্নেহের মধুর তিরস্কার শুনে কাঁদব কি হাস্‌ব আজ ?

"পোড়ারমুখী তবু বসে রইলি! উনুনটা ধরিয়ে নেবার নাম-টুকু পর্য্যন্ত নেই! বলি—ও ছোঁড়া—ময়না না নাকি—সব চাকর বাকরদের শুদ্ধ নাই দিয়ে মাথায় চড়িয়েচিস আর একগুঁয়েমি-টুকুও ষোল আনা শিখে রেখেচিস। অন্য কেউ কিছু ক'র্‌তে গেলে মেয়ের আবার মুখখানা তোলো হাঁড়ি হ'য়ে ওঠে। শাশুড়ীর ত রান্নাঘরের দরজা-মাড়াবার হুকুমটি নেই, কি জ্বালা-তনই ক'রতে তুই সুরু ক'রেচিস্ ঊর্মি! সেখানে থাক্‌তে আমাকে যেমন জ্বলন জ্বলাতে, এখানে দিদির ওপরেও তাই লাগিয়েছ, ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে সব ব'সে ব'সে ভোগ খাচ্চি আমরা—জেনেও কিছু করবার পথ নেই। নাঃ তবু সেই গোঁ ধরে রইলি!"

আমি বেশ এক চোট হেসে নিয়ে ব'ললাম "ইস্ ছোট মা! এ হ'য়েচে কি! আজ এই ঊনিশ কুড়ি দিনের ভেতরে মাথার অর্দ্ধেকের ওপর চুল সব পেকে গেছে'যে! চল ওপরে আমি চট্ ক'রে হাতটা ধুয়ে নিয়ে এক্ষুনি সব তুলে দিচ্চি।"

"মুখপুড়ী বাঁদরী আক্কেলের মাথাও কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেয়ে-ছিস! আজ বাদে কাল ছেলের মা হবি, হাঁরে তোর কি জ্ঞান-গম্যি একটুও হবেনা ?"

"আচ্ছা চল বাবার কাছে, আমি সত্যি ব'লছি না মিছে টের পাবে। অর্দ্ধেক কি তিনভাগ পেকে গেছে। হাঁ ছোট মা উকুন নেই ত আর! সেবারে মনে আছে! কত ক'রে তোমার মাথার উকুন ছাড়িয়েছিলাম! ইস্! এতখানি এতখানি—"

"মুখে লাগাম দে বাঁদরী মুখে লাগাম দে, চুল তোর আমার চেয়েও বেশী পাকবে তা ব'লে রাখলাম। আবাগীর তবু নড়ন চড়ন নেই; বাছাকে যে একটু চা দিতে হবে আর সে ময়না হতভাগাই বা গেল কোথা! ডেকে সাড়া নেই।"

"তার গেলে ত চ'লবেনা ছোট মা! নইলে আমি এতক্ষণ পাঠিয়ে দিতাম। বাড়ীর মধ্যে ঐ ত জানাশোনা একটা চাকর। নতুনটা সে ত ভূতের দাদার বাবা। ময়নায় যাওয়া সম্ভব হ'লে আমি তাকে ছটার ট্রেণে পাঠাতাম—তোমার বাছার কাছে এক পেয়ালা চা দিয়ে—"

"উমি! আমার আর রাগ বাড়াসনি। এর পর আচ্ছা—"

সবুর কর দেখি টাইম টেবলখানা আর কখন বর্দ্ধমানের ট্রেন আছে। যা হোক ক'রে না হয় চা দিয়ে ময়নাকেই পাঠাব।"

"বর্দ্ধমানে পাঠাবি কি লো! বরং দেখ্ বহরামপুরে যাবার গাড়ী কটায়, আমি তোকেই পাঠাচ্ছি সেখানে।"

"সে তুমি পাঠালে যেতে হবে বই কি, তবে তোমার সোনা-মণি যাদুধনটি আর রতনপুরে নেই। ভোরবেলায় গোপাল

তোমার গরু নিয়ে বর্দ্ধমানের গোঠেই যান কিম্বা ছিপ্ সুতো নিয়ে শ্যামসায়ার কৃষ্ণসায়ারে মাছ ধ'রতেই যান, গেছেন নিশ্চয়ই। আবার ছেলে তোমার এত দুষ্টু ছোট মা যে, যাবার সময় কাকেও ব'লে যাননি। মনুয়া পাকৃড়া ক'রেছিল ব'লে শুধু কোথায় যাবেন দয়া ক'রে সেটা জানিয়ে গেছেন। তাও আবার সত্যি না আর কিছু সে ভেবে দেখবার ক্ষমতা দৈবজ্ঞ ছাড়া আর কারও নেই।"

"কবে আসবে তাও ব'লে যায় নি! তাইত বর্দ্ধমানে হঠাৎ কেন গেল! সে ত তেমন ছেলে নয়। ব'লে যায়নি কবে আসবে?"

"মনুয়াকে ত বলেনি। তবে যেদিন ফিরে আসবে সেইদিন জানা যাবে। ব'সনা ছোট মা ঐ পিঁড়িটার ওপর ততক্ষণ আমি ঝাঁ ক'রে কেটলিটা ধুয়ে এনে বাবার চা টা ক'রে দি।"

নিখিল নাথের কথা ।

মাসীমাকে ধীরেশের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে যেদিন আমার আস্‌বার ঠিক ক'রেছিলাম, একটা শক্ত কেস হাতে আসাতে সে ধার্য্য দিনে পৌঁছুতে পারিনি ব'লে এখানকার সকলেরই উৎকণ্ঠার আর সীমা পরিসীমা ছিল না। হা রে হতভাগ্য চাকুরে বাবু! স্বাধীনতার মাথা ত দাসখৎ লিখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিবিয়ে খেয়েচ; কিন্তু মা বাপ স্ত্রী পুত্রের স্নেহের বাঁধনটা ত কাটাতে পারনি! তারা যে তোমারই আসার আশা ক'রে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়ে দিয়েচে।

বাড়ীতে ত এলাম, মা বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে দেরির কৈফিয়ৎ দিয়ে তাঁদের কোলেও আশ্রয় পেলাম। কিন্তু এখন ঘরে যাই কেমন ক'রে তোমরা তার উপায় পাঁচজনে বলে দাও গো। এ যে কোন কৈফিয়ৎই মান্‌তে চায় না। এ একগুঁয়েমীর গোঁ এখন ভাঙ্গি কি দিয়ে? মাসীমার সঙ্গে আমি আস্‌তে পারিনি ব'লে উমার আর অভিমান রাখ্‌বার জায়গা নেই। সে বলে শক্ত কেস হাতে পেয়ে কেন নতুন ডাক্তারকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি চ'লে এলাম না। কোম্পানী যাকে যোগ্য ভেবে তোমার জায়গায় বাহাল ক'রেচে কেন পারবে না সে

দেখ্‌তে কঠিন রোগ। এতই কি তুমি বাহাদুর বাবু যে একই জায়গায় লেখাপড়া শিখে আর একই কলেজ থেকে পাশ ক'রে তার দর চেয়ে নিজের দর বেশী বাড়িয়ে তুলচ? এতগুলো লোক এখানে ভেবে সারা আর উনি সেখানে দিব্যি আরামে উড়ে বামুনের ঝোল চচ্চড়ী খেয়ে ভুঁড়ি বাগাচ্ছিলেন। পুরুষ কিনা, কারও তরে ভেবে ত আর উপোষ দিতে হয় না।"

এ কথার আর জবাব কি দেব? উমা আমার প্রতি অগাধ ভালবাসায় এতদূর অন্ধ যে কোন কৈফিয়ৎ দিয়েই তাকে থামানো যায় না; কিন্তু খুঁটিনাটি জবাবের ভেতর দিয়ে অনেক কথাই হ'তে হ'তে দু'জনকারই অজ্ঞাতে কখন যে আশপাশের রাগ অভিমানগুলো কোনদিকে স'রে গেল তা আমিও যেমন টের পেলাম না, তেমনি যিনি জেরা ক'রে আমাকে হার মানা-বার চেষ্টায় ছিলেন তিনিও কিছু বুঝ্‌লেন না। আমি ঘরের ভেতর কায়েমী ক'রে জায়গা পেলাম ঠিক তখন, যখন উমা শুন্‌তে চাইলে আমার সেই হঠাৎ হাতে পাওয়া সাংঘাতিক কেসের আগাগোড়া বিবরণটা।

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে কখন যে সন্ধ্যা উত্‌রে গেছে তা টের পাইনি, কিন্তু যখন অন্ধকারে দুজনেই দুজনকার মুখের দিকে চেয়ে ঝাপ্‌সা দেখ্‌লাম, তখন উমা ব'ল্‌লে "ইস্‌ রাত্তির হ'য়ে গেছে তা ব'ল্‌তে হয় না! আচ্ছা বেহুঁস লোক ত তুমি। বকৃতে

সুরু ক'রেচ ত ক'রেই চ। দাড়াও, থামো, আগে আলোটা ঠিক ক'রে দি।"

"আচ্ছা দাও। কিন্তু সব দোষ বুঝি আমারই ঘাড়ে চাপাবে? আমি বুঝি মাথার দিব্যি দিয়ে তোমায় সাধ্‌তে গেছলাম—ওগো! কথাটা তোমায় শুন্‌তেই হবে—না শুন্‌লে আমি দম আট্‌কে মারা যাব? সব দোষ ত নন্দঘোষের বটেই।"

"তাই বই কি! তুমিই ত আগে থাক্‌তে সাফাই গাইবার চেষ্টায় ছিলে।"

"নইলে ঘরের দরজার ওপর চৌকাঠের মাথায় যে দিব্যি ক'রে লিখে রেখেছিলে—

'প্রবেশ নিষেধ'।"

"আচ্ছা বেশ যাও আর বকামিতে কাজ নেই। এবারে আলো জ্বালা হ'য়েচে—কিন্তু না দাঁড়াও আগে কিছু তোমার জলযোগের ব্যবস্থাটা ক'রে দিই। খেতে খেতে ব'ল্‌বে, কি বল?"

খাবার দিয়ে উমা নিজের নির্দ্দিষ্ট চৌকিটার ওপর আলো রেখে আমার পাশটিতে ব'সে ব'ল্‌লে "কুলিগুলো ভোরবেলা কাজে বেরুতেই তাদের ধাওড়ার সাম্‌নে দেখ্‌লে মেয়েটা অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে, তারপর?"

"হাঁ তারপর শোন। সমস্ত রাত্তির বৃষ্টিতে ভিজে শুধু

অজ্ঞান হওয়া নয় তার গায়ের রঙ্‌টা পর্য্যন্ত মড়ার মত ফ্যাকাসে মেরে গেছ্‌লো। সেদিনের সে যে কী-বৃষ্টি! সারারাত্রি কোলিয়ারীর রেজিং পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। কেউ ঘরের বের হ'তে পারেনি। মেয়েটার দেহ অত্যন্ত সবল ছিল আর হার্টের ভেতর কোন গোলমাল ছিল না ব'লে—কোন রকমে ঘণ্টা দুয়েকের ভেতর আগুনে সেকে আর ইনজেকসন্‌ দিয়ে অনেক ক'রে তাকে মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে আন্‌লাম। কিন্তু ভাল রকম জ্ঞান হ'তে সেদিন ত গেলই তার পরের দিনমানটাও এক রকম কেটে গেল।

বলকারক ওষুধ পথ্যির জোরে আর রীতিমত শুশ্রূষার গুণে দুদিনের দিন তার যেন মাঝামাঝি রকমের জ্ঞান হ'ল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা শোন—ভাল রকম জ্ঞান হওয়ার পর তাকে আমি কোন রকমেই আর কিছু খাওয়াতে পার্‌লাম না, এক চামচা দুধও না। উঃ সে যদি দেখ্‌তে—একেবারে ধনুক-ভাঙ্গা পণ। যতবার দুধ দিতে গেলাম জোরের সঙ্গে আমার হাতখানা ততবারই ঠেলে দিতে লাগ্‌ল।

তার বিছানার একটু দূরেই বড় সাহেব ব'সেছিলেন। আমি ভাব্‌লাম হয়ত সাহেবের সাম্‌নে খেতে লজ্জা হ'চ্চে ব'লে এমন ক'র্‌চে। সাহেবকে জানাতেই তিনি উঠে বাইরে গেলেন। কিন্তু তবু সেই একই রকম ভাব। কিছুতে খাবে না। এতক্ষণ

পর্য্যন্ত তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করিনি—সেও বোধ হয় কিছু বলার দরকার বোধ করেনি। না খাওয়ার কারণ জানতে চাইলে সে ব'ল্‌লে কি জান? 'আমাকে চেষ্টা ক'রে বাঁচানোতেই আপনার বিস্তর অপরাধ হ'য়েচে, আর খাইয়ে দাইয়ে নীরোগ ক'রে আপনি পাপের বোঝাটা বেশী ক'রে বাড়াবেন না ডাক্তারবাবু। কি মর্ম্মভেদী করুণ সুরেই যে এ কথাগুলো তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, মনে হ'ল যেন প্রত্যেক কথার পরতে পরতে কতই না নিরাশার ব্যথা মিশানো আছে। চোখের সে ব্যর্থ চাহনি, আর মুখের সে হারানো ব্যথা জাগিয়ে তোলা ভাবটুকু দেখে আমি আর চেষ্টা ক'র্‌লাম না তাকে তখন নতুন ক'রে কিছু খাওয়াতে। এমনি নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে আরও পাঁচ সাত মিনিট কেটে গেল। বড় সাহেব আড়াল থেকে রোগীর ভাবভঙ্গী সমস্ত দেখ্‌ছিলেন ভেতরে এসে আমায় ব'ল্‌লেন "ডাক্তার, এ গরীব অথচ ভদ্রঘরের মেয়েটিকে হাঁসপাতালের অন্য রোগীদের কাছে রাখার সুবিধেও হবে না আব খুব সম্ভব ও থাকৃতেও চাইবে না। তার চেয়ে তুমি ওকে তোমার বাংলোতেই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।"

আমিও এ কথাটা যে ভাবিনি তা নয়, কিন্তু বাসাতে তখন তুমি বা মাসীমা কেউ নেই আমি একলা তাকে নিয়ে কি ক'রে চারদিকের তাল সামলাব সেইটাই মনে মনে তোলা পাড়া

কর্‌ছিলাম। ঝি চাকরদের ওপর আমার সব ভার দেওয়া থাকলেও এ ভারটাত আর ছেড়ে দিলে চ'লবেনা। তাহ'লে যে ওকে যে পথ থেকে টেনে এনেচি সেই পথেই আবার ঠেলে ফেল্‌তে হবে। কিন্তু তবু তাকে আনতেই হ'ল আমাদের বাসাতে। না আনলে বাস্তবিকই হিত না হ'য়ে নানান দিকের অসুবিধায় প'ড়ে অহিতটাই ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা হ'য়ে প'ড়ত।

ভরপুর সন্ধ্যা তখন। বাদ্‌লার বাতাস হা হা ক'রে খোলা মাঠটার ওপর দিয়ে ব'য়ে চ'লেচে। আমাদের বাংলোর পশ্চিমের সেই ছোট্ট নদীটির ও পারের পলাশ গাছটায় কতকগুলো কাক সন্ধ্যার ধূসর আঁধারে গা ঢেকে মাঝে মাঝে এক একবার কা কা ক'রে ডেকে উঠ্‌ছিল আর উদাস বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দের সঙ্গে তাদের সেই মিলিত রব ভেসে এসে প্রাণের ভেতরকার বীণাটার ছিন্ন তারে ঘা দিয়ে যেন বেসুরো রাগিণীতে একটা উদাস ঝঙ্কারের সৃষ্টি কর্‌ছিল। দারুণ উৎকণ্ঠা বুকে বেঁধে আমি ব'সে আছি ঠায় সে অভাগিনী রোগোনীর রুগ্নশয্যার পাশটিতে। শুশ্রূষার দরকার নাই, ওষুধ দেওয়ার ঝঞ্ঝাট্ নাই, পথ্য করাবার জ্বালা নাই, তবু বসে আছি তাকে আগ্‌লে—সেই স্তিমিত দীপ্‌-শিখাটির পানে তাকিয়ে—আশঙ্কা, যদি ঝড়ের ঝাপ্‌টানির বেগ সইতে না পেরে হঠাৎ নিভে যায়।

এমনি ক'রেই রাত্রি ১টা বেজে গেল। রোগিনীর অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। ভালর দিকে তেমন না যাক্ এতটা সময়ের মধ্যেও মন্দের দিকে যে যায়নি তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ছিল ব'লেই—সে অবস্থাটা হঠাৎ বেঁকে দাঁড়াল গিয়ে একেবারে বিকারের মাঝখানে।

ছম্‌ছমে দুপুর রাত্রি, চারিদিক নিঝুম্ নিস্তব্ধ। জ'লো হাওয়ার সন্‌সনানির সঙ্গে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক্ মিশানো শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। আগের দিন থেকে ঝড় বাদল হওয়াতে কল্ কার্‌খানাও সব বন্ধ। মাঝে মাঝে ধাওড়ার দিক থেকে হাঁস মুর্‌গীর অস্ফুট গোলমাল এলো মেলো বাতাসের সঙ্গে ভেসে আস্‌ছিল।

শুনলে অবাক হ'য়ে যাবে অত দুর্ব্বল থাকা সত্ত্বেও সে বিছানা ছেড়ে একেবারে উঠে দরজার ডান দিকের আল্‌মারিটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সেটাকে টেনে খুলবার চেষ্টা ক'র্‌চে। অবস্থাটা একটু সুস্থ দেখে, আমি তার কাছ থেকে উঠে গিয়ে মেঝেতে ব'সে বেদানার রস তৈরি ক'র্‌ছিলাম; আল্‌মারী টানার শব্দ কানে যেতেই ব্যাপার দেখে একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি তাকে ধর্‌তে যেতেই মস্তিষ্কের অত্যাধিক দুর্ব্বলতায় আর সে খাড়া থাকতে না পেরে সেখানেই প'ড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে এলায়িত দেহটা না যদি ধরে ফেল্‌তাম তা হ'লে মাথাটা

গুঁড়িয়ে গিয়ে সেখানেই হতভাগিনীর দগ্ধ জীবনটার সব শেষ হ'য়ে যেত। আবার অজ্ঞান হ'য়ে গেল দেখে চাকর বাকরদের ডাক্‌লাম, তারা পাশের ঘরেই ঘুমুচ্ছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রীতিমত তদ্বির আর ওষুধের জোরে জ্ঞান হ'তেই এমন ধারা ব'ক্‌তে সুরু ক'রে দিলে—আমি ডাক্তার ব'লেই সে ভয়ানক রাত্রিতে সাহস ক'রে তার পাশে ব'সে সে প্রলাপ শুন্‌তে পেরেছিলাম, কিন্তু আমার বুক যে মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠেনি সে কথা বল্‌বার সাহস আজ আমার একটুও নেই। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল ক'রে আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে যখন বল্‌লে "ডাক্তার না ছাই তুমি—অতবড় আলমারীটার ভেতর অতগুলো শিশি পূরে রেখেচ শুধু সব চেয়ে দরকারী যেটা সেটাই রাখ্‌তে তোমার গোবর পোরা মাথায় জুগিয়ে উঠেনি। জ্বালা আর কত সইব বল? ভেবেছিলাম তুমি অতবড় পাশকরা ডাক্তার—তোমার ঘরে আমি যা চেয়েছিলাম তার অভাব হবেই না। কিন্তু না—আর হয়ত পেলেও পেতে পার্‌তাম, তুমি ত ভাল ক'রে বুঝ্‌তে দিলে না। ওগো! ডাক্তার! একটিবার আমায় ছেড়ে দাও আমি দেখে আসি তোমার ও আলমারীতে বিষের শিশি একটাও আছে কিনা। একটিবার, তোমার পায়ে পড়ি ডাক্তার বাবু একটিবার আমায় দাও ছেড়ে, তোমাদের ওষুধে ত বিষও থাকে, দাওনা একটু এনে! হয় আমায় ছেড়ে

দাও নইলে দাও এনে বিষ। এই তোমার পা কামড়ে রইলাম না দিলে কিছুতে ছাড়ব না।"

সত্যি সত্যি সে আমার পায়ের বুড়ো আঙুলটাকে এমনি জোরে কামড়ে ধ'র্লে যে আমি যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে ব'ল্লাম "দিচ্ছি এনে, ছেড়ে দাও।"

পা ছেড়ে আমর হাত দুটো চেপে ধ'রে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। হতভাগীর মরমছেঁড়া সে কান্না যেন এখনও আমি কানের কাছে স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছি। কতকটা সাম্‌লে নিয়ে সে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল—"আমাকে বাঁচাও গো! আমি আর সইতে পারিনে। বুক্‌খানা ভেঙ্গে চুর্‌মার্‌ হ'য়ে গেল যে। আমাকে বাঁচাও—এ ছার প্রাণটাকে কোন রকমে নষ্ট ক'রে দিয়ে। মেরে ফেলে আজ আমাকে, রক্ষা কর এ নিদারুণ কষ্টের হাত থেকে।"

বুঝলাম তার ক্ষুদ্র জীবনের কাহিনী অনন্ত, বিশাল। আর তার প্রতি ছত্রটি দুঃখ কষ্টেরই বিচিত্র চিত্রে রং ফলানো, তখনও তার জীবনের সব কথাই আর পাঁচজনের মত আমারও কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কেবল অনুমানে টের পেয়েছিলাম—নির্ম্মম সংসার তাকে অসময়ে অসংখ্য বিপদ আপদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাষাণ অপেক্ষাও পাষাণ হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েচে। সমাজ অত্যাচারের নিষ্ঠুর কষাঘাতে এমন তরুণ সুকোমল তনুখানি ক্ষত-বিক্ষত ক'রতে একটিবারও পেছন ফিরে দাঁড়ায়নি। হা রে

অভাগিনী ! যদি পথ ভুলে এসেই প'ড়েছিলি কুটিল এ সংসারের পথে, তবে অত্যাচারের সূচনা দেখে, উপায় থাকতে থাকতে স'রে পড়বার চেষ্টা করিসনি কেন ? আজ এ ভবের হাটে ব'সে সর্ব্বস্ব খুইয়ে নিঃসম্বল তুই, কেমন করে চলবি সে পথের মাঝে কাঁটায় যার প্রত্যেক ধূলিকণাটুকুও নিবিড়ভাবে সমাচ্ছন্ন।

"হাঁ ডাক্তারবাবু ! কোন উপায়ই—কি ক'রতে পার না ? তুমিও ত মানুষ, ওগো ! তুমিও ত দুঃখ কষ্ট যে কি জিনিস তা বুঝতে পার ; তবু কেন মুখ ফিরিয়ে রইলে ? সংসারের সব মানুষ গুলোর মতই তুমিও কি আমার প্রাণের বেদনা বুঝলে না ? তবে কেন আমাকে নিয়ে এলে এখানে ? কি অপরাধ করেছিলাম তোমার, যে এত কষ্ট আজ দিতে ব'সেচ তুমি ?"

তখনও সে আমার হাত দুটি চেপে ধ'রে বিছানায় প'ড়ে আছে। অনাহারে তার মস্তিষ্কের উত্তেজনায় শরীরে শক্তি ছিল না, তাই নিতান্ত নির্জীবের মতই শুয়ে ছিল।

বিকার পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ হ'য়েচে মনে ক'রেছিলাম ; কিন্তু এ ত ঠিক বিকার নয়, এ যে দেখছি রোগিনীর অতীত জীবনের অবরুদ্ধ দুঃখের স্রোত হঠাৎ সুমুখের বালির বাঁধটা জোর করে ভেঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়েচে ! উন্মাদ এ অবিশ্রান্ত কল্লোল আজ থামাব কি দিয়ে আমি ? তার এ প্রাণ পোড়ান দুঃখের করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে আমারই চোখে বর্ষার দুকুল-প্লাবি বান

ডেকে গেল। সান্ত্বনা দিয়ে রোগিনীকে সুস্থ ক'রে তুলবো-না নিজেই কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলাম।

ওষুধ পথ্যি দেওয়া তখন মাথায় উঠেচে। শুন্‌চি, কেবল শুনচি তার সে অসংলগ্ন অথচ অতি কঠোর সত্য আর করুণ ব্যথায় ভরা প্রলাপ বচন-বিন্যাস। শুনলে তুমি চককে উঠবে উমা। অভাগীর সব কথার ভেতরে যেন আমাদের সে অপ্রত্যাশিত মিলন দিনটির কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু সব শুনতে পেলাম না, অনর্গল ব'কে ব'কে ভোর হ'তেই শ্রান্ত দেহখানা তার ঘুমের আবেশে এলিয়ে পড়লো। আমিও অন্ততঃ চিকিৎসক হিসেবে আর কোন কথা ব'লবার চেষ্টা করলাম না। কৌতূহল মনের ভেতর দেবে রেখে, সকাল হ'তেই হাঁসপাতালের কাজে বেরিয়ে পড়লাম। তার বিছানার পাশে ব'সে রইল সেই নতুন ঝি ধনিয়ার মা।

বেলা ১১টা বাজে বাজে। ফিরে এলাম দিনের কাজ সব শেষ ক'রে, আর নতুন ডাক্তারকে হাঁসপাতালের সব চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে।

রোগীর ঘরে গিয়ে দেখি, অনেক সুস্থ সে। ধনিয়ার মা বেদানা ছাড়িয়ে দিচ্চে আর সে বিছানায় আড় হ'য়ে শুয়ে সে গুলো রুচির সঙ্গেই খেয়ে যাচ্ছে, আমি ঘরে ঢুকতেই কতকটা থতমত খেয়ে ফলগুলো বিছানার পাশেই মাটিতে রেখে গায়ের

কাপড় চোপড় সব গুছিয়ে নিয়ে বেশ ভদ্রতার সঙ্গেই "আসুন, নমস্কার" ব'লে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে, আমার পায়ের ধুলো নিতে হাত বাড়ালে। আমি খুব বেশী মাত্রাতেই চমকে উঠে ছিলাম তার এই পায়ের ধুলো নেওয়া দেখে, কিন্তু কি কমনীয় তার চরিত্র! কত জন্ম জন্মকার নিগূঢ় সম্বন্ধই যেন তার সঙ্গে আমার আছে! ধীর প্রশান্তস্বরে আবার ব'ললে—"আপনার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না, এ কথাটা ব'লবনা কখনো—শোধ যে ক'রবনা, শুধু এই টাই আজ আপনার পায়ে জানিয়ে দিচ্চি। অভাগিনী স্বজন পরিত্যক্তার জন্য দেবতার চেয়েও আপনি ঢের বেশী বেশী করচেন। ধনিয়ার মার মুখে শুনলাম সমস্ত ঠিক্‌ঠাক ক'রেও এই সর্ব্বনাশী পাতকিনীর জন্যেই আপনার দেশে যাওয়া হয়নি। আর আমাকে নিমিত্তের ভাগী না ক'রে আজকেই দেশে রওনা হ'য়ে পড়ুন, যম যাকে ডেকে নিয়ে অপমান ক'রে পুরী থেকে তাড়িয়ে দেয়, তার ত সামান্য এক আধটু অসুখে কিছু যাবে আসবেনা! আপনাকে আর বেশী কি বলবো—আমার এ তুচ্ছ প্রাণটাকে—যা জিইয়ে রাখবার কোন দিনই প্রয়োজন ছিল না, তাকে রক্ষা ক'রতে যা ক'রেচেন আপনি—মাত্র সেই কথাটুকু স্মরণ ক'রে, দাসী ব'লে, অভাগিনী জন্ম দুঃখিনী ব'লে, মনের কোণে সামান্য একটুখানি ঠাঁই দেবেন। মায়ের পেটের বোন যদি আপনার থাকে, তা হ'লে তারই পাশে

দাঁড়াবার অধিকারটুকু আজ আমায় দিয়ে যেতে হবে দাদা ব'লেই সে দু হাতে আমার পায়ের তলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

আমারও বুকের ভেতরে তখন স্নেহের প্রবল তুফান ব'য়ে চলেচে। আত্মহারা হয়ে তার মাথার অবিন্যস্ত কেশগুচ্ছে হাত দিতে দিতে ব'ললাম "আমার মার পেটের বোন ত নেই দিদি। তাই আজ থেকে আমার মায়ের স্নেহ-শীতল কোলের একটা পাশ ছেড়ে দিলাম তোকে। তুইই আমার মায়ের পেটের বোন। তবে চল্ দিদি আমার সঙ্গে—সেখানে গিয়ে আমরা দুটি ভাই বোনে মায়ের কোলে শুয়ে কত অতীত দিনের সুখ দুঃখে রঙিন্ স্বপনের মাঝে ডুবে থাকিগে।"

তুমি হয়ত ব'লবে উমা, যে আমি এত অল্প সময়ের ভেতরে কেমন ক'রে তাকে এত আপনার ব'লে ভেবে নিতে পার্‌লাম; বাস্তবিক তুমি কেন, যে এ কথা শুনবে বিস্মিত হ'য়ে সেইই এ প্রশ্ন ক'রবে। কিন্তু দেখতে যদি তার সে কোমল দুঃখময় কিশোর তনুখানি, সে স্নেহের ধারায় সিক্ত করা মুখখানির দিকে চাইতে যদি একবার, তা হ'লে আমারই মত কিম্বা আমার চেয়েও বেশী ক'রে তাকে তুমিও নিজের ক'রে নিতে একটুও বিলম্ব ক'রতে না।

তারপর তাকে সঙ্গে ক'রে রতনপুর আনার প্রস্তাব করাতে

সে রাজী হ'ল না। ব'লে, "আপনি বাড়ী যান। সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্‌ ক'রে না যাওয়াতে সবাই ভাব্‌চেন; একটা খবরও তাঁদের দেওয়া হয় নি। আমি একটু সুস্থ হ'লেই বেরিয়ে পড়বো এখান থেকে। যদি ভগবান মায়ের স্নেহ ভোগ করার অদৃষ্ট আমায় দিয়ে থাকেন, তা হ'লে দুদিন পরে যেমন ক'রেই হোক্‌না আমি যাবই সেখানে। যে কদিন না একটু সাব্যস্ত হ'তে পারি, দয়া ক'রে এখানে সে কদিনের মত থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে যান। তারপর নিশ্চয়ই সে দেশের পানে ছুটবো আমি আমার এ পিপাসা-কাতর কঠিন প্রাণটা নিয়ে। মেয়ে মানুষ ব'লে আমাকে নিতান্ত অবলা ভাব্‌বেন না। দুঃখ, কষ্ট, নিরাশা—এরা সব যত্ন ক'রেই আমায় নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। কিন্তু আপনাকে আজ যেতেই হ'বে। আপত্তি কিছুতে টিকবে না তা এখন থেকেই ব'লে রাখ্‌চি।"

আমি ব'ললাম, "যখন নিজের বোন ব'লে তোমায় ডেকেছি তখন তোমায় না নিয়ে কেমন ক'রে যাব?"

উত্তর পেলাম, "মায়ের কষ্ট—উমার কষ্ট—সে সব গুলো ত ভুলে গেলে চ'লবে না দাদা।"

তোমার কথাও সে ধনিয়ার মার মুখে সব শুনেছিল। তা'র অত্যধিক পীড়াপীড়িতে অগত্যা আমাকে চ'লে আস্‌তে হ'ল।

দু পাঁচ দিনের মধ্যে যাতে রতনপুরে সে আস্‌তে পারে, আমি তার ভাল ব্যবস্থাই ক'রে রেখে এসেছি। এখন মনের ঠিক রাখ্‌তে পারলে হয়—বড় জ্বালার প্রাণ তার।

উমা এতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমার কথাগুলো যেন গিলে খাচ্ছিল। এবারে ব'ললে, "কিন্তু এত কথা হ'ল, তার নামটি কি সে কথা ত একবারও বল'লে না?"

"ও হাঁ। কণা—রেণুকণা তার নাম।"

ধীরেশের কথা।

(ক)

আমি বাপের ত্যজ্যপুত্র। বল্‌বার যা কিছু আছে তার সূচনার পূর্ব্বেই এটুকু জানিয়ে দেওয়া আমার খুবই উচিত যে নিজের দোষেই মা বাপের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আজ নিতান্ত দীন হতভাগ্য ভবঘুরের মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেদিন বাবা আমার কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে নিতান্ত নির্ম্মমের মত আমাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন, আমার পাপ মনটা সেদিন কিছুতে সায় দিতে চায়নি যে যা করছি আমি সেটা সত্য সত্যই

মা বাবার চোখে এবং দশের চোখেও কত বড় অমার্জ্জনীয় অপ-রাধ। কিন্তু আজ অসীম দুঃখ কষ্টের সর্ব্বোচ্চ সোপানে দাঁড়িয়ে সকলকে জানিয়ে মুক্তকণ্ঠে আমায় স্বীকার করতেই হ'বে যে, ওগো! আমি দোষী—সহস্রবার দোষী। কিন্তু পিপাসা-কাতর প্রাণটা নিয়ে শুধু মরীচিকার পানে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আজ আমার অন্ত কিছু নাই।

বেশ বুঝি আশা আমার কতদূর ভ্রান্ত—বেশ জানি মরীচিকায় জল নাই—তবু জানি না কেন ছুটি তারই আশায়, চেয়ে থাকি কেন সেই নিরাশাভরা সুদূর পথের পানে।

পিতামহের আমল থেকে আমরা পশ্চিমের প্রবাসী। দেশে যে প্রকাণ্ড জমিদারী আছে, তারই জোরে রাজার হালে এতকাল চলে আসচে আমাদের। দেশ একটা আছে কিন্তু তা কখনও চোখেও দেখিনি, কানে তার নামটিও শুনিনি। দেখা শোনার দরকার বা কৌতূহলও কখনো হয়নি। আদালের ঘরের দুলাল সেজেই এতকাল কাটিয়েছিলাম—কে জান্‌তো যে নিরাশ্রয় হ'য়ে আজ আমাকে চোখের জলে বুক ভাসাতে হ'বে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গোড়ার পরীক্ষাটা দিতে গিয়েই একটা প্রকাণ্ড ধাক্কার তাল সামলাতে না পেরে ফিরে এসেই আর কারও অনুরোধ উপরোধ গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌লাম না। তাস, পাশা,

দাবার আড্ডার সৌষ্ঠবটা বাড়িয়ে তুল্‌তে আমার সে কী প্রাণপণ চেষ্টা হ'ল তখন। পাড়ায় পাড়ায় গুণ্ডামি ক'রে বেড়ানর অপরাধ দিয়ে বাবা অনেকদিন স্নেহের শাসন যে না ক'রেছেন তা নয়; কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী: সকাল সকাল পেটটাকে যা তা দিয়ে ঠেসেই রোজ রোজ যেতাম ছুটে সেই গ্রামের শেষে চড়কতলার ছোট্ট আড্ডার ঘরটির প্রবল মায়ার আকর্ষণে। রাত্রি ১০টা ১১টার কম বাড়ী ফেরা কোন দিনই হ'ত না, বরং মাঝে মাঝে আরও বেশী হ'য়ে প'ড়ত।

ক্লান্ত দেহখানা বিছানায় ঢেলে দিয়ে এমনি একদিন ঘরের ভেতর অঘোর ঘুমুচ্ছি—মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল; চোখ মুছে বিছানায় উঠে ব'সে দেখি সারা বাড়ীখানি এত রাত্রিতেও আলোতে ঝক্‌মক্‌ ক'রচে। আর অনেকগুলো লোক অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে চারিদিকে ছুটোছুটি ক'রচে।

মা ব'ল্‌লেন, "ওঠ বাবা! চোখে মুখে জল দিয়ে নে শীগ্‌গীর।"

আমি কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে তাঁর মুখের দিকে চাইতেই তিনি আমার হাতটা ধ'রে ব'লে উঠ্‌লেন, "লক্ষ্মী যাদু আমার, ওঠত গোপাল, বাড়ীতে—"

মায়ের কথা শেষ না হ'তেই একটা হাতবাতি নিয়ে বাবা ঘরে

ঢুকে বল্‌লেন, "কই ধীরু উঠ্‌ল না? এই যে উঠেছিস্‌ ধীরু? আয় মুখ ধুয়ে শীগ্‌গীর।"

মুখের সাম্‌নে বাবার কথার জবাব কোন দিনই দিতে পারিনি, সে দিনও কিছু বল্‌তে পারলাম না। ঘুমের ঘোর কাট্‌তে না কাট্‌তেই তিনি আমার হাত ধ'রে আমাদের বাড়ীর পর পর আরও ৪।৫ খানা বাড়ী পার হ'য়ে একখানা দোতলা বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌লেন। বাবার আর আমার পেছনে পেছনে আরও ৮।১০ জন লোক গোলমাল ক'র্‌তে ক'র্‌তে সেখানে এসে প'ড়্‌ল। একটুখানি রাস্তা চলাতেই ঘুমের ঘোর আমার বেশ কেটে গেছ্‌লো। দেখি না একটা বিয়ের আসর—লোকজন, বাজী বাজ্‌না, আলো, লুচি-মণ্ডা—কিছুরই অভাব নেই সেখানে; ভাবলাম নেমন্তন্ন খেতে এসেচি। কিন্তু কি ভয়াবহ ব্যাপার! সব প্রস্তুত, বিয়ের উপকরণ যা যা দর্‌কার সব আছে, অভাব কিছুরই নাই, অথচ ক'ণের বাপ্‌ ঘন ঘন চোখ মুছ্‌চেন, বাড়ীতে যেন মড়া কান্না। ব্যাপার তলিয়ে বোঝ্‌বার শক্তি আমার কোন দিনই ছিল না, কিন্তু এমন আশ্চর্য্য ঘটনা, বিয়ের রাতে বাড়ীর ভেতর মড়া কান্না শুনে আমি যেন কেমন মুশ্‌ড়ে গেলাম। চারদিকে চেয়ে দেখি—না—তাইত—এ যে ভীষণ দৈব বিড়ম্বনা! বর নেই! বিয়ের বাড়ীতে লুচি মণ্ডার ছড়াছড়ি যাচ্চে; রসোনচৌকির দল—তাও ছাদ্‌না তলার অল্প দূরেই তল্পী তল্পা নিয়ে ব'সে আছে। সব আছে—

অথচ কি সর্ব্বনাশ ! যার বিয়ে তার এতটুকু চিহ্ন কোনখানে খুঁজে পেলাম না। ভেবে ব্যাপারটা কি বুঝ্‌তে না বুঝতেই কন্যা-কর্ত্রী ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠে আমায় একেবারে বুকে জড়িয়ে ধ'র্‌লেন। তার পর একরকম কোলে ক'রে তুলে নিয়েই আমায় ছাদ্‌না তলার সাম্‌নের পিঁড়ি খানার কাছে দাঁড় করাতেই চেলীর কাপড় হাতে আমাদের পাড়ারই শশী নাপ্‌তে ব'ল্‌লে, "কাপড়-খানা যে ছেড়ে ফেল্‌তে হবে দাদাবাবু !"

স্তম্ভিত এবং কতকটা ভীত হ'য়ে বাবার দিকে চাইতেই তিনি ব'ল্‌লেন, "হাঁ, কাপড়টা ত ছাড়তে হবে ধীরু ! ওটা ছেড়ে ফেলে ঐ চেলীটা প'রে আসনে ব'স। পুরুৎ ঠাকুর অপেক্ষা কর্‌চেন, আজ তোর বিয়ে —"

আমার বাবা বরাবরই বড় জেদী, খেয়ালের মাথায় তিনি যখন যা মনে হয়, ভাল মন্দ তলিয়ে না দেখে তখনই তাই ক'রে বসেন। টাকা পয়সার ভাবনা ভুলেও কোনদিন ভাবতে হয়নি, তাই খেয়ালের বশে চলার বা যা ইচ্ছা তাই করার জন্য এক দিনের তরেও কোন বাধা পেতে হয়নি তাঁকে।

বিধির আশ্চর্য্য বিধানে আজ যিনি আমার শ্বশুর, তিনি আমাদেরই দেশের একজন বেশ সম্পন্ন ব্যক্তি। কন্যার বিবাহের ঠিক ঠাক ক'রেছিলেন এই পশ্চিমেরই একটা সহরে। অত দূর দেশ থেকে বিয়ে দেওয়াটা নিতান্ত অসুবিধা-

জনক মনে হওয়ায় তিনি আমাদের এই গ্রামে এসে বাসা নিয়ে বিবাহের যা কিছু আয়োজন সব ঠিক ক'রে, ধার্য্য দিনটিতে শুভ-লগ্নের সময় বরের আগমন প্রতীক্ষায় ব'সেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ যখন ষ্টেশন থেকে লোক ফিরে এসে সেদিনকার সাংঘাতিক ট্রেন কলিসনটার খবর তাঁকে জানিয়ে দিলে, তখন তাঁর এবং সঙ্গে সঙ্গে পাত্রীর আপনার লোক ব'লতে যে যেখানে ছিল, সকলকারই কান্না চেপে রাখবার এতটুকু সান্ত্বনা কোন খানেই রইল না।

সেই নিশীথ নিঝুম রাত্রিতে দুঃসহ এই কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোককে উদ্ধার ক'রতে উঠে দাঁড়ালেন স্বয়ং আমার বাবা, আর তাঁকে উৎসাহ দিতে কারও দরকার হ'লনা; কারণ খেয়ালটা পুরো-মাত্রায় মাথায় চেপে ব'সেচে তখন। বাবার না হ'ল দরকার কন্যা দেখার বা আশীর্ব্বাদ করার, না হ'ল সময় বংশ-মর্য্যাদার বিষয়টা নিয়ে এক মূহুর্ত্তও মাথা ঘামাবার।

চারদিকের বিপদের বেড়া আগুনে প'ড়ে এই ভদ্রলোকের যা অবস্থা তখন দাঁড়িয়েছিল, তাতে বাবার মত লোক কোন রকমেই যে স্থির থাকতে পারে না,তা আমি ভাল করেই জানতাম, অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে, কিছু না দেখে শুনে যার তার সঙ্গে এই নিশুতি রাত্রে ঘুমন্ত ছেলেকে টেনে নিয়ে গিয়ে, কোথায় কি ভাবে তার অদৃষ্টটা যে কার সঙ্গে জড়িয়ে দিতে বসেছিলেন তিনি, তা আর কেউ তাঁকে বুঝিয়ে বলবার সাহসও সেদিন পায়নি। বিশেষ

সে ভয়াবহ মূর্ত্তির পানে চাইতে গিয়ে সবাই যেন বলি-বলি ভাবটা মনের ভেতরই চেপে রাখতে বাধ্য হ'য়েছিল, এমন কি আমার মা ও।

বাবা স্থির প্রশান্ত মূর্ত্তিতেই দাঁড়িয়ে রইলেন আর সকলে একটা ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ভীষণ কল্পনা এঁকে দেখ্‌তে লাগল সেই বিপন্ন ভদ্রলোকের হতভাগিনী কন্যার কুমারী-জীবনের অবসান মুহূর্ত্তটুকু :

বিয়ে আরম্ভ হ'ল। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ সমান ভাবেই চ'লেচে। আমি যেন তার প্রত্যেক কথাটি প্রাণের সঙ্গেই বুঝে উচ্চারণ ক'রে যেতে লাগলাম। হঠাৎ মন্ত্রের সঙ্গে ২।১ টা নাম উচ্চারণের সময় সভাস্থ লোক একসঙ্গেই যেন কেমন একটা অব্যক্ত কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠল। ভীষ্মের ন্যায় প্রতিজ্ঞায় অটল অচল পিতৃদেব আমার সে কথা কানেও তোলেন নি; বিপন্নের উদ্ধার করার সাফল্যটুকু বুকে নিয়ে তিনি বোধ হয় তখন সেখানকার ঘটনা চোখে দেখেও বোঝবার জ্ঞান হারিয়ে অন্য এক ভাবরাজ্যে আপনার মনটাকে পাঠিয়ে শুধু বাইরের চোখ দুটো দিয়েই সকলের দিকে এক মূক চাহনি চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কোন কথাই শোনবার বা বুঝে উঠবার ক্ষমতা ও ধারণা তাঁর ছিল না তখন। কত যুগযুগান্তরের পরিচিত অথচ অত্যন্ত অজানা অচেনা একজনের সঙ্গে আমার হৃদয়টা—দেহটা—এক কথায়

সমস্তটাই জড়িয়ে দিতে গিয়ে পুরুতঠাকুরও বেঁকে ব'সলেন। কি একটা কারণে এমন অমিল হ'য়ে গেল যাতে ক'রে বিবাহ এ দুয়ের মধ্যে দেওয়াটা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

বাবার আমার তখনও তন্ময়তা ভাঙ্গেনি। কন্যাকর্ত্তা কোন রকমে ফিস্ ফিস্ ক'রে দুকথা পুরুত মশায়কে ব'লতেই আর বাধা রইল না। শুভ কি অশুভ এখন ব'লতে চাই না, তবে সে আরব্ধ কাজ শেষ হ'য়ে গেল। অশুভক্ষণের মাঝখান দিয়ে কন্যার সঙ্গে আমার অশুভ শুভদৃষ্টিটাও হ'তে বাকি থাকল না।

ঘুমের ঘোরে উঠে এসেছিলাম বাবার সঙ্গে, ভেবে—যাচ্ছি নেমন্তন্ন খেতে; কিন্তু তার বদলে হ'য়ে গেল বিয়ে। আমার আর বেশী মাথা ঘামাবার শক্তি ছিল না। আমি তখন চেয়েছিলাম শুধু একটুখানি জায়গা, শুয়ে বাকি ঘুমের জেরটুকু মিটিয়ে ফেলতে।

বিয়ের পরে মনের মতন ক'রে সাজানো বাসর-ঘরে গিয়ে দেখি, তোলো হাঁড়ির মত আঁধার করা কতকগুলো মুখ সেখানে, গোলমাল ত দূরের কথা নিশ্বেসও বোধ করি সবার নাক দিয়ে বেরুচ্চে না। আমি সটান বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম; খেতে বা কথা কইতে কেউ ডাকেওনি, বলেও নি। বাড়ীর ভেতর তখন ডাকাত পড়ার গোলমাল। কান্নার চাপা ও স্পষ্ট আওয়াজ, তামাসার টিটকারী আর তাল বেতালায় মিশেল করা হাসির

বিটকেল শব্দে শুধু সে বাড়ীখানা নয়—আশপাশের জায়গাগুলোও যেন কাঁপতে সুরু ক'রেচে।

আমার পা তলার দিকে আমারই দেওয়া সেই রক্ত গোলাপের মালাছড়াটি গলায় জড়িয়ে লাজ-নম্র কিশোরীটি তখনও নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমার দিকেই তাকিয়ে ব'সেছিল। দেখলাম—হাঁ চেয়ে দেখার মতন রূপ বটে! কি সুন্দর নিটোল নিখুঁত গঠনটি। আর দেখেছিলাম তার কণ্ঠের সেই রক্ত গোলাপের মথিত সৌন্দর্য্যের ম্লান আভাটুকু, সেই কত যত্নে গড়া কুসুম কলিকার ক্ষীণ হারানো আশার শেষ রেশটুকু! তখনও মালাটি কিশোরীর কণ্ঠে তেমনি ক'রেই দোল খাচ্চে কিন্তু আজ যেন সে সর্ব্ব বিষয়ে নিরাশ—নিঃসম্বল! নির্ম্মম পুষ্পগুচ্ছের দলিত শোভাহীন ছিন্নহার! মন্দভাগিনী কিশোরীর অশুভ মুহূর্ত্তের শুভ বরমাল্য!

কখন সকাল হ'য়ে গেছ্‌লো তার টেরও পাইনি। বাড়ীর ভেতরে কত রকমের যে গোলমাল চ'লেছিল তাও শুনিনি। কেবল ঘুমের ঘোরে মড়ার মত প'ড়েছিলাম আমার সেই বাসরঘর-খানিতে। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই দেখি, পূর্ব্বের খোলা জান্‌লাটা দিয়ে সূর্য্যের প্রখর আলো এসে কাল্‌কের সেই নিঝুম রাতে হঠাৎ পাওয়া সঙ্গিনীর মুখ চোখ লাল ক'রে দিয়েছে। দেখলাম রাত্রির সেই বুকে জড়িয়ে ধ'রে দুজনকার শোওয়ার ভঙ্গীটি ঠিক তেমনি আছে। দেখলাম এত দুঃখের ভেতরেও তার এই সামান্য

সাফল্যের হর্ষে মুখ চোখ লাবণ্যে ঢল্ ঢল্ ক'রছে। আদর ক'রে মৃদু আঘাত দিতেই সে জেগে উঠল। হা রে অবলা বালিকা! জীবন যে তোর সেদিন সমাজের পায়ে কি অশুভ মুহূর্ত্তে উৎসর্গ হ'য়ে গেছ্‌লো—ভাগ্য যে তোর কত বড় অচেনা পুরুষের কঠোর হাত দুটির ঘায়ে ছন্নছাড়া হ'য়ে প'ড়েছিল—যত্নে গড়া দেবতার উদ্দেশে সাজানো তোর সে আকুল কবরী কার নির্ম্মম আলিঙ্গনে শিথিল হ'য়ে প'ড়েছিল—তা কেমন ক'রে বুঝ্‌বিরে তুই? মা বাপের কোলে কোলেই এত বড়টা হ'য়েছিলি, স্নেহ মমতা যত্ন ভালবাসার দুলালী হ'য়েই দিন কাটিয়েছিলি—আজ যে দুর্ভাগ্য তোর কঠিন নিষ্ঠুর সমাজের পায়ে তোকে আছ্‌ড়ে মেরেছে, তাকে ত চিনিস্‌নি কোনদিন, নিমেষের ক্ষুদ্র চাহনিটুকু দিয়েও ত সে পীড়নকারীর ছায়াটুকু চোখে দেখবার অবকাশ পাস্‌নি কখনো।

(৪র্থ)

এইবারে বলি কেন তার সে ছিন্ন মালাটিকে অশুভ মুহূর্ত্তের শুভ বরমালা ব'লেছিলাম, কেন তার সে সাধের সাজানো মোহিনী কবরী শিথিল দেখে অজ্ঞাতে শিওরে উঠেছিলাম—আর এখনও কেন তাকে মন্দভাগিনী ব'লচি।

মা বাপে নাম রেখেছিল তার রেণু। তীর্থ ক'রতে কাশীতে এসে, বিশ্বনাথের মন্দিরে তাঁরই চরণরেণু এই হতভাগিনী বালিকাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাঁরা, তাই এ সাধের নাম রেণু—রেণুকণা। বয়স তখন তার চার পাঁচ; কলকণ্ঠের কাকলী দিয়ে স্নেহের বান ডাকানো স্বরে কেবল সে তখন ব'লতে শিখেচে—"আমাল নাম নেণুকণা।"

এই অপোগণ্ড শিশুকে বুকে ক'রে সন্তানহীন জনকজননী দেশে ফিরে এলেন। তারপর বুকে বুকে মানুষ হ'তে লাগল রেণু—দিনের পর দিন বাড়তে লাগল সে অকলঙ্ক চাঁদটি, আলো ক'রে তার সেই বিশ্বনাথের দেওয়া জনক জননীর নিবিড় নীল স্নেহমাখা হৃদয় আকাশের তল।

দিন চ'লে যায় সে অতীতের দেশে, বাড়িয়ে দিয়ে রেণুর বয়স—আর দিয়ে যায় একটা গভীর সঙ্কেতের নিশান খাড়া ক'রে তার মা বাবার চোখের সাম্‌নে—ঠিক গভীর রাতের সজাগ প্রহরীরটির মতন।

এগারো তারপর বারো—তবু হ'লনা, তের—তাও পার হ'য়ে যেতে ব'সেচে কিন্তু মিল্‌ল না সে মনের মতন দিব্যকান্তি পুরুষটিকে, আসবেন যিনি ধন্য ক'রতে রেণুর নারী জন্মটাকে। যত লোক আসে, সাধ ক'রে এই শুভ্র কুন্দকুসুমটীকে নিয়ে যেতে তাদের ঘরে, কত লোক আসে পুত্র-

বধূরূপে সাজাতে, কন্যারূপে ভালবাসতে এই কোমলতা আর সরলতার প্রতিমাখানিকে, কিন্তু কি যায় পর রেভী ব্যথা পেয়ে— না জান্‌তে পেরে এই বালিকা-বত্নের জন্য বিবর্ণ।

চৌদ্দ বৎসরের মাঝামাঝিতে তখন রেণু। তার পালক পিতা অনেক কষ্টে ঠিক ক'রলেন একটি সম্বন্ধ—এই পশ্চিমেরই কোন এক সহরে। বাঙ্গালী, কিন্তু অনেকদিন দেশ ছাড়া, তাই তাঁরা তেমন খুঁটিনাটি কিছু জানতে চাননি। মেয়ের রূপ দেখেই দেনা পাওনার ফন্দ ক'রে পঞ্জিকা খুলেছিলেন। দিনও ঠিক হ'য়েছিল। কিন্তু বিধি বিড়ম্বনা! সেই অতি বড় ভাগ্যবান পুরুষটি, যিনি বহু তপস্যার ফলে পেতে ব'সেছিলেন এই নারীরত্ন, তিনি নিতান্ত অনাহুতের মতই মৃত্যুর দেশে চ'লে গেলেন ; বিয়ে ক'রতে এসে ট্রেন কলিসানে তাঁর সব আশা মিশে গেল সেই অনন্তের দেশে—রেখে দিয়ে একটা দুঃসহ শক্তিশেল, এই নির্মল নির্দ্দোষ বালিকাটির কুসুম-কোমল ক্ষুদ্র বুকের মাঝখানটিতে। কিন্তু ঘাড়ে চাপলো এই মধুর কঠিন ভার, দুর্ব্বল ক্ষীণ এবং পরাধীনের ঘাড়ে, যে তা কোনদিনই বইতে পারবে না, জান্‌তে পেরেও এ রত্নের অমূল্য মূল্যের কথা।

আগেই ব'লেছি আমার বিয়ের সময় একটা অস্ফুট গোলমাল আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্ষীণ আপত্তি উঠেছিল—আজ জানতে পারলাম তার কারণ। রেণুকে যখন তার পালক পিতামাতা

কুড়িয়ে পান তখন তার পরিচয়, মাত্র এটুকু জানতে পেরেছিলেন তাঁরা—যে সে ব্রাহ্মণ-কন্যা। আর কাশীতেই তার বাপ মায়ের মৃত্যু হয়। কিন্তু স্নেহের অনুযোগ এড়াতে না পেরে অপুত্রক পিতা এই কন্যাটিকে সাতরাজার ধন এক মাণিক ভেবেই কোলে তুলে নিতে পেছন ফিরে তাকাননি, ভাবেননি যে পরের ঘরে তাকে পাঠাতে হবে কি সম্বল দিয়ে—কায়স্থের মেয়ে ব'লে না ব্রাহ্মণ কন্যার পরিচয় জানিয়ে।

পশ্চিমে এসে তিনি যে বিবাহের ঠিক্‌ঠাক্ করেছিলেন, তারা ছিল কায়স্থ, তাই রেণুও কায়স্থ-কন্যার পরিচয় টীকা কপালে প'রেই তাদের ঘরে যাবার সাজ সেজে ব'সেছিল। তারপর সে সব যখন আকস্মিক বিপৎপাতে লণ্ডভণ্ড হ'য়ে গেল, তখন দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটেছিলেন তার বাবা, আমার বাবার কাছে—উদ্ধার হবার জন্য এই অকূল পাথার থেকে।

এই অপ্রত্যাশিত বিপদের কথা শুনে আমার পরদুঃখকাতর পিতা জানতে চান্‌নি কন্যার কুলশীলের এবং সর্ব্বোপরি তার জাতি-ধর্ম্মের পরিচয়। বিপদ যখন, তখন উদ্ধার ক'রতেই হবে এই ছিল তাঁর চির-কালকার খেয়াল।

যখন পুরোহিত কায়স্থের বিয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে দিতে অস্বীকার করেন, বাবা তখনও তাঁর তন্ময়তা কাটিয়ে জানতে চান নি যে, সমাজের চোখে আজ কত বড় অন্যায় কাজটা ক'রতে বসেচেন।

রেণু ব্রহ্মাণ কন্যা এই কথা বলাতে, আর দক্ষিণার টাকাটা সংখ্যায় কিছু বেশী হওয়াতে পুরোহিতের পক্ষ হ'তে আর একটুও গোলমাল আসেনি। এ অশুভ বিবাহের সব কাজ সে রাত্রির মত নির্ব্বিবাদেই শেষ হ'য়েছিল।

পাঁচসাতখানি গ্রাম ও সহরের মধ্যে প্রবাসী বাঙ্গালীদের সমাজ-পতি আমার বাবা। সে দিক থেকে আপত্তি আসবার আভাসও সেদিন কেউ দেয় নি। কিন্তু তথাপি কন্যার মা বাবা আর অন্য আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই ভাবী অশুভের আশঙ্কায় বুকের কান্না চেপে রাখতে পারেনি।

রেণুর আত্মীয়দের আশঙ্কাটাই ফ'লে গেল। বাবা তাঁর পুত্রবধূকে বাড়ী নিয়ে যেতে এসে, সমাজের প্রবীন গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের মুখে জানতে পারলেন যে, ব্রাহ্মণ-কন্যা হ'লেও কায়স্থ ব'লেই কন্যার পালকপিতা তার বিবাহ দিতে সঙ্কল্প ক'রে-ছিলেন। জন্মদাতা পিতা না হ'য়েও তিনি এই নিরপরাধা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে নিজেরই ঔরসজাতা ব'লে তাঁরই বংশ গোত্র অনুযায়ী সম্প্রদান ক'রতে ব'সেছিলেন; আর সে অন্য কাকেও নয়—নিষ্কলঙ্ক এক ব্রাহ্মণ-সন্তানকে, যে এই দেশেরই প্রবল পরাক্রান্ত জমীদার এবং এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের ক্ষুদ্র সমাজের নেতার একমাত্র পুত্র। অবশেষে পাঁচজনের কথা এমন কি পুরোহিতের আপত্তি কেউ গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে তিনি যেন তেন

প্রকারেন ক'রে মেয়েকে পাত্রস্থা ক'র্তে দ্বিধা করেননি—এই নির্দ্দোষ অনাঘ্রাত ফুলের মত কোমল প্রাণ বালক বালিকা দুটির সুদূর ভবিষ্যতের করুন ছবি নিজের চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেয়েও না।

একমাত্র পুত্রের বিবাহটা একেই ত নিতান্ত সামান্যভাবে একরকম আত্মীয় বন্ধুর অজ্ঞাতেই বিধির বিপাকে হ'য়ে গেল, তার ওপর এই দুর্ঘটনার কথা শুনে বাবার তালুকের ধৈর্য্যের বাঁধটা এক পলকেই ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল। রাগে তিনি এতদূর জ্ঞানহারা হ'য়ে প'ড়েছিলেন যে, সে মূর্ত্তি দেখে এমন কেউ ছিল না যে ভয়ে তাঁর কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যায় নি। বাবা রেণুর বাবাকে বেশ কড়াস্বরেই ব'ললেন, "একদণ্ড যদি তুমি এখানে থাক, তা'হলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব, যদি একটুও নিজের বা অন্য আত্মীয় বন্ধুর জীবনের মায়া থাকে, তা হ'লে এক লহমাও বিলম্ব ক'রতে পাবে না, বেরিয়ে পড় এক্ষনি এইদণ্ডে—"

হতভাগিনী রেণুকণার স্বামীর ঘরে যাবার সুবর্ণ সুযোগ আর ভাগ্যে জুটল না। পিতার সঙ্গে যেখান থেকে এসেছিল একদিন, আবার সেখানেই চ'লে গেল। দুদিনের তরে এসে সে কেবল এ দেশের লোকের প্রাণে তার অভিশপ্ত অদৃষ্টের একটা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের ছাপ মেরে দিয়ে গেল। ওরে ও অভাগি! এই কিশোর বয়সেই যে তোর যথা সর্ব্বস্ব হারিয়ে গেল রে!

তোর মিলন রাতের সে শিথিল-কবরী যে শিথিলই র'য়ে গেলরে! আর বাঁধ্‌বি কবে? দেখাবি কাকে? দেখবে কে আর?

গাঁট ছড়ার কাপড় ছেড়ে যে বেশে ঘুমিয়ে ছিলাম নিজের ঘরে, আবার সেই বেশ প'রেই বাড়ীতে ফিরে এলাম। সে বারে গেছলাম বাবার হাত ধ'রে আরও কত লোকজনের সঙ্গে, এবারে আসতে হ'ল সবার অজ্ঞাতে, যেন নিতান্ত নিঃস্ব ভিখারীর সাজ সেজে প্রাণের ভেতর সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার ভাবটুকু জাগিয়ে তুলে।

* * * *

দু'চার মাস যেতে না যেতেই এ সব ঘটনা সবার মন থেকে এক রকম ধুয়ে মুছে গেল। আবার আমার নতুন ক'রে বিয়ে দেওয়ার কথাবার্ত্তা হ'তে হ'তে এক রকম ঠিকঠাকও হ'য়ে গেল। বাবার কথার কোন দিনও অবাধ্য হইনি, আজও হ'তে পারলাম না। দস্তুর মত বরের পোষাক প'রে রসন চৌকী গোরার বাজ্‌না বাজিয়ে রিজার্ভ ট্রেনে রওনা হ'লাম আবার বিয়ে ক'রতে। এবারে যার সঙ্গে এই চিরঅদৃষ্টটা যোগ লাগাতে চ'লেচি আমি, সেও শুন্‌লাম নাকি অপূর্ব্ব সুন্দরী। আমার মন তখন সব চিন্তার বাইরে। সুন্দর অসুন্দর বিচার করবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা তখন আমার ছিল না। হায়! আজও যে আমি রেণুর সেই এক রাত্রির দেখাটা ভুলতে পারিনি!

কথায় বলে সিন্দুরই দাও আর কাজলই দাও—ভবি ভোল্‌বার নয়। বাবা যেমন একবার আমার বিয়ে দিয়ে একজনকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবারে ভগবানও ঠিক তেমনি ভাবে না হ'লেও, কতকটা সেই রকমই ক'রে বাবাকে তার পাল্টা অপমানটা ফিরিয়ে দিলেন। সেখানে সেজে গুজে গিয়েও বিয়ে আমার হ'ল না। অনেক দিনের নির্দ্দিষ্ট পাত্রটিকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গেল ব'লে কন্যার বাবা তার হাতেই মেয়েকে দান ক'রলেন। আমরা ফিরে এলাম সেখান থেকে—কতকগুলো লুচিমণ্ডা পেটে পুরে—লজ্জার চড় গাল পেতে খেয়ে। কিন্তু কথায়—কথায়—অনেকটা এগিয়ে এসে পড়লাম। এবারে আমার ত্যাজ্য পুত্র হওয়ার বিবরণটা ব'লে ফেলি। তারপর যখন আমার এ বারে বারে ফিরে আসার কপালটা উল্টে দিতে তৃতীয় বারে আবার নতুন ক'রে বিবাহের বন্দোবস্ত হ'ল, তখন আমি এ বিবাগী মনটাকে আর কিছুতেই বশে রাখতে পারলাম না; সে বেঁকে বসলো। আগেই ব'লেছি বাবা অত্যন্ত খেয়ালের বশে আর জিদের মাথায় সব কাজ ক'রতেন, কারও মতামতের অপেক্ষা রাখা তাঁর স্বভাবে ছিল না। আমি ব'ললাম "আমার বিয়ে একবার হ'য়ে গেছে, ধর্ম্মতঃ আমি সেই স্ত্রীর সঙ্গেই সংসার ধর্ম্ম ক'রতে বাধ্য, যদি তাকে পাওয়া আমার পক্ষে সত্য সত্যই অসম্ভব হয় তা হ'লে যেমন চ'লছে

এমনি ভাবেই জীবন কাটানো ছাড়া আর আমি অন্য কিছু ক'রতে পারব না।"

বাবা রেগে অনেক ভয় দেখিয়েও কিছুতেই আমাকে রাজি করতে পারলেন না। যাকে পাবার আশায় দিন গুনে গুনে আজও বাকি দিন শেষ ক'রে উঠতে পারলাম না, তাকেও পেলাম না, মা বাবারও স্নেহের কোল চিরদিনের তরে হারিয়ে ব'সলাম। যেদিন তৃতীয় বারের বিবাহে অসম্মতি জানালাম, সেই দিনই বাপের ত্যজ্য পুত্র হ'য়ে আশৈশবের চির পরিচিত মমতার সমস্ত বস্তু ছেড়ে সামান্য ভবঘুরের বেশে এসে মানভূমে কোলিয়ারীর ৫০৲ পঞ্চাশটাকা মাইনের কেরানী গিরিতে ভর্ত্তি হ'তে অতবড় জমীদারের পুত্র হ'লেও পেটের দায়ে আমার কিছুমাত্র বাধল না।

কিছুদিন চাকরীর পর নিখিলকে পেলাম জীবনের প্রধান সহচর আর বন্ধুর মতই ; তার মাসীমাকে পেয়ে মায়ের অভাব মিটল ; কিন্তু হৃদয়ের শূন্যতা যেমন তেমনি র'য়ে গেল।

(গ)

একদিন যেখানে বিয়ে ক'রতে এসে অপমানের ছাপ গায়ে মেখে বাড়ী ফিরে যেতে হ'য়েছিল, আশ্চর্য্য হবে অন্যে শুনে যে আজ আমি সে দেশেই চাকরী ক'রতে এলাম, আর সব চেয়ে

প্রাণের বন্ধু পেলাম তাকে, যে আমারই জন্য নির্ব্বাচিতা পাত্রীর গলায় একান্ত অতর্কিতে এসেই সেদিনকার সে শুভ্র মালাছড়াটি পরিয়ে দিয়েছিল।

সব জেনে শুনেও আমি নিজের ইচ্ছাতে এখানে বাসা বাঁধলাম, আমার এ নিষ্ঠুর অভিশপ্ত জীবনের বাকি দিন গুলো কোন রকমে কাটিয়ে দিতে। এখানে থাকলে সে দিনের সে পরিহাস ও অপমানের কথাটা কোন দিনও ভুলবনা, আর রেণুর সে শেষ বিদায়ের মূক চাহনিটুকুও বুকের পরতে পরতে জীবনের চরম দিনটি পর্য্যন্ত এঁকে রাখতে পারব।

দুর্দ্দশার শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে আজ আমি প্রাণের ভেতর যে কতখানি অভাব অনুভব ক'রছি তা প্রকাশ ক'রে বলবার নয়। ভগবানের কাছে আর আমার পরিনীতা স্ত্রী, যাকে আমি পবিত্র বেদ মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে দেবতা সাক্ষী ক'রে গ্রহণ ক'রেছিলাম তার কাছে আর কতদূর অপরাধী হ'য়ে থাকব? প্রায়শ্চিত্ত করবার অমূল্য সুযোগ যখন পেয়েইছি তখন আর কেন তা হারিয়ে ব'সব! তাকে ত এ জীবনে পাবার নয়, সমাজের লোহার মত শক্ত শিকলটা দিয়ে হাত পা এমনি ক'রে বাঁধা আছে যে সে কঠোর বাঁধন এড়িয়ে হয় ত কোন দিনই সে বাঞ্ছিতের কাছে পৌছুতে পারব না। তথাপি বাড়ী থেকে বেরিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমার শ্বশুর মশায়ের দেশের

সন্ধান পেয়ে তাঁর কাছে গেলাম—আমার সে সাধের অনাঘ্রাত কুন্দ কুসুমটিকে ফিরিয়ে আনতে কিন্তু তার দেখা পাওয়া দূরের কথা উল্টে আমার বাবার সে দিনের সে চরম অপমান করার শাস্তিটা উপলক্ষ্য ক'রে শ্বশুর মশায় আমারই ঘাড়ে তার হাজার গুণ বেশী অপমান চাপিয়ে দিলেন।

কর্ত্তব্যের খাতিরে আর রেণুকে লাভ করবার আশাতে আমি সে আগুনের ঝলকার মতন কথা গুলো সব সহ্য ক'রেছিলাম; কিন্তু তবু তাকে পাইনি। একটিবার একটি পলকের দেখা পাব ব'লে কী কাণ্ডটাই না করলাম সেদিনে! হতাশ হ'য়ে ফিরবার সময় রেণুর বাবাকে জানিয়ে এসেছিলাম আমার চাকরীর জায়গা আর ঠিকানার কথা। ভবিষ্যতে যদি তাঁর মন ফেরে যদি তিনি—কিন্তু ওরে নিষ্ঠুর আঁধারে ঘেরা সুদূর ভবিষ্যৎ আমার!

অল্পদিনের আলাপে বন্ধুত্ব যে এত গাঢ় হয় তা আমি কেন যারা দেখেচে তারাও আগে ভাব্তে পারেনি। নিখিলের অনুরোধে মাসীমাকে তাদের বাড়ীতে পৌছে দিতে গেলাম রতনপুরে। নিখিলের স্ত্রী তিনিও তখন সেখানে ছিলেন। তাঁর সে কি সুন্দর অতিথি সৎকার! যে ভাল হয় তার সবই ভাল। নিখিলের মা বাবার ত তুলনাই হয় না। এমন অমায়িক—আমি যেন নিখিলের মতই তাঁদের আর একটি সন্তান।

পুরো দুটোদিনও রতনপুরে থাকতে পারিনি আমি। নিখিলের স্ত্রীর অত ভক্তিশ্রদ্ধা ও আদর আপ্যায়ন আমার অদৃষ্টে সইল না। কি জানি প্রতি পলে পলে যেন কেমন ধারা অন্য মনস্ক হ'য়ে পড়লাম। আমার উদাস আনমনা ভাব দেখে বাড়ীর সকলের মনেই যে কেমন একটা কিছু জানবার কৌতূহল এসেছে তাও বুঝলাম। তারপর হঠাৎ নিখিলের "বাড়ী রওনা হলাম" ব'লে যে টেলিগ্রাফটা এল তাই উপলক্ষ্য ক'রে তাকে বর্দ্ধমান থেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে খুব ভোরেই রতনপুর ষ্টেসনে গিয়ে বর্দ্ধমানের টিকিট কিনে গাড়ীতে চেপে ব'স্‌লাম। আসবার সময় বাড়ীর একজন চাকরকে "বর্দ্ধমান যাচ্চি" ব'লে রওনা হ'য়েছিলাম। আর কাকেও কিছু বলা হয়নি।

সংসারে এসে পাওয়ার মত পাওয়া যাকে বলে তা সবই পেয়েছিলাম, কিন্তু ভাগ্যের দুঃসহ বিপর্য্যয়ে যেদিন বাপের ত্যজ্য পুত্র হ'য়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েচি সেদিন থেকেই জানি—জীবনের সবটুকু সাফল্য আমার নিষ্ফলতার গভীর গহ্বরেই মিশিয়ে গেছে।

বর্দ্ধমানের টিকিট কিনে গাড়ীতে চেপে ছিলাম; নামবার কথাটা মনে হ'তেই তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখি আসানসোলের কাঁকড় বিছানো—বিশাল প্লাটফরম! তখন ছমছমে দুপুরবেলা—রদ্দুরে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে সেখানেই

প'ড়ে গেলাম। সারারাত্রি অনিদ্রায় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে কেবল ভেবেচি আমার এ কঠোর নিয়তির কথা। অবসাদে দেহটা যেন আপনা হ'তেই মাটীতে গড়িয়ে প'ড়লো। সাধ্য কি সে ভীষণ ধাক্কা সামলাই! আছাড় খেয়ে প'ড়লাম—প্লাটফর্মের একটা আলোর খুঁটির গায়ে। তার পরের ঘটনা আর মনে নেই।

অনেকটা রাত্তিরে চেতনা ফিরে পেতেই চারদিকে চেয়ে দেখলাম মস্তবড় একটা ঘরের মধ্যেসামান্য খাটিয়ায় শুয়ে আছি আমি। আশে পাশে একই রকম খাটিয়াতে আরও চার পাঁচটি রোগী নির্জীবের মত প'ড়ে আছে। আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম! দয়া ক'রে কে আনলে আমাকে এখানে? মাথার কাছে দেখি ওষুধের মেজর গ্ল্যাসটা হাতে ক'রে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে। তার পোষাক পরিচ্ছদ দেখে আর গৃহের আস্‌বাব্‌ পত্রের কথাটাও মনে মনে ভেবে আমার একটুও বুঝ্‌তে বিলম্ব হ'লনা যে এটা হাঁসপাতাল। ওষুধটা গিলে ফেলে নার্শকে জিজ্ঞেস্‌ ক'রতেই শুনলাম রেল কোম্পানীই দয়া ক'রে আমাকে এখানে এনে ফেলেচেন। নইলে—থাক্ সে কথা আর কেন? ভবিতব্যের আকর্ষণে আজ রাজার মত বাপ বর্ত্তমানেও আমি সরকারী হাঁসপাতালের একজন নিতান্ত হীন অবস্থার রোগী মাত্র। পথের সম্বল যা ছিল, পকেটে হাত দিয়ে আর তা খুঁজে পাইনি তখন!

উমার কথা।

কথায় বলে পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী। চাকুরে বাবু যাঁরা, তাঁদের ছুটি ভোগ করাটাও কতকটা সেই ধরনেরই। তিন মাস ছুটি পেয়ে ডাক্তার বাবু এলেন বাড়ীতে—ওমা! তিন তিনটে মাস ঠিক যেন ৫।৭ দিনের মতই চোঁ চোঁ ক'রে কেটে গেল। আবার সেই মামুলি সতরঞ্চি কম্বল জড়িয়ে বিছানা তোষক এঁটে বাক্স তোরং সাজিয়ে চটে মুড়ে লগেজ করবার ধুমধাম! বাপ্! পারাও যায়না ছাই এমনি ক'রে দু'দিন অন্তর বাঁধা খোলা।

ছোটমার এবার আমাদের সঙ্গে আসা হ'ল না। কতকগুলা নিজের বিষয় সম্পত্তির নিতান্ত দরকারী কাজে তাঁকে দেশে যেতে হ'ল। কথা রইল ওখান থেকেই তিনি কোলিয়ারীতে যাবেন।

আমরাই দুটি কপোত কপোতী ফিরে চ'ল্লাম আবার আমাদের সেই পুরোন বাসাতে। বম্বে মেল, ফার্ষ্ট ক্লাস বার্থ রিজার্ভ, পাশে স্বামী, অফুরন্ত বুক ভরা আদর সোহাগ ভালবাসা নিয়ে—ওগো! তোমরা পাঁচজন সতী সাবিত্রীর দল! একবার এ নগণ্যা নারীর মাথায় তোমাদের পায়ের ধুলো দাও গো!

হু হু শব্দে এদেশ ওদেশ নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত ছাড়িয়ে গাড়ী ছুটেচে ত ছুটেই চ'লেচে। সেই কখন বর্দ্ধমানে একবার থেমেছিল তার পর আর বিরাম নেই চলার; রাত্তির কাল বটে, কিন্তু ঘুমুই কি ক'রে? চোখের পলক ফেল্‌তেই মনে হচ্চে ঐ যা হয়ত বা একটা ছোট্টনদী পাহাড়ের পায়ের তলে আছাড় খেতে খেতে ছুটে যাচ্ছিল দেখা হ'ল না, কোথাও হয়ত মস্ত পুকুরটির বুকে কুমুদে চাঁদে কোলাকুলি হচ্ছিল এড়িয়ে গেলাম, দেখতে পেলাম না। খালি এই সবই মনে আসে চোখের পাতা বুজি কেমন ক'রে।

আমার পাশের লোকটিত চৈতন্য হারিয়ে ব'সে আছেন। গায়ে ধাক্কা দিলেও সাড়া পাওয়া যায় না। অনেক ক'রে ত ধ্যান ভাঙ্গিয়ে জিজ্ঞেস্ ক'রলাম, "এবার গাড়ী থামবে কোথা?" মাত্র পাঁচ অক্ষরে কথার জবাব পেলাম "আসানসোল্"!

"আর কত দেরী হবে সেখানে যেতে?"

"এই আর কত? এই ধরনা তোমার গিয়ে—"

"ইয়ে, কাজ নেই আর তোমাকে দিয়ে। এখন কিছু খেতে হবে যে, ঠিক হ'য়ে ব'স খাবার গুলো বের ক'রে নি।"

"মন্নুয়াকে ডাকনা, সেইত দিতে পারে এসে"।

"জ্বালাতন আর কি! এক হাত জায়গাও হাঁটতে হবে না হাত বাড়িয়ে নিয়ে খুলে খাওয়া, তাতেও অন্যের সাহায্য, তাতেও

চাকর না হ'লে চ'লবে না? যত কেবল 'সিরাজদ্দৌলা' দেখি এই চাকুরে হাঘরের দলকে। যাদের তিন দিনের জায়গায় সাড়ে তিন দিন বাড়ী ব'সে থাকলে খাতায় নাম কাটা যাবার ভয়, তাদের আবার নবাবী কেন এত বাবু? চলো, আমিই সব ঠিক ক'রে নিচ্চি। মন্থুয়া ঘুমুচ্চে একটু ঘুমুক না।"

স্বামী খেতে খেতে ব'ল্লেন "বর্দ্ধমানে যতটুকু সময় পওয়া গেল, খোঁজ ক'রেও ত ধীরেশের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। হতভাগাটা গেল কোথা বল দিকিনি?"

"ঐ যে ব'ললাম পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। সেই রতন-পুরে একদিন দেখেই আমি বুঝেছি যে তিনি পরীর দেশে এক-দিন না একদিন উড়বেনই।"

"কিন্তু আসানসোলটাতেও একবার ভাল ক'রে খোঁজ খপরটা নিতে হচ্চে, কি বল?"

"তা দেখ!"

"কেবল যে ভাসা ভাসা জবাব দিচ্চ, আঁা?"

"তার সঙ্গে ত আমার তেমন ক'রে জানা শোনা নেই তবে রতনপুরে দেখে মনে হ'য়েছিল—কি একটা নিয়ে তিনি সর্ব্বদার জন্য ভাবেন। তাই বল্লাম পরীর দেশে গেছেন।"

কথায় কথায় দুজনকারই খাওয়া শেষ হ'ল। সার্জেন্টের গাড়ী থেকে মন্থুয়াকে ডেকে তার খাবার দিলাম। এদিকে গাড়ীও

আসানসোলের প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ালো। মনুয়াকে সজাগ-ক'রে আমার গাড়ীতে থাকতে ব'লে, ডাক্তার বাবু গেলেন তাঁর বন্ধুর বকেয়া অনুসন্ধানের জের মেটাতে।

খানিক চুপ্‌চাপ্‌ থেকে আমিও নেমে প'ড়লাম। প্লাটফর্মের যেখানটায় আমাদের গাড়ীখানা, ঠিক তার সামনের একটু বাঁ দিকেই হঠাৎ নজর পড়ায় দেখ্‌লাম একটি ভদ্রলোক, বোধ হয় রেলের একজন বাবু অতি সামান্য অবস্থার মত পোষাক পরিচ্ছদ পরা একটি স্ত্রীলোককে ব'লছেন "এ গাড়ীতে কোথাও যদি তোমার যাবার মতলব থাকে ত বল আমি এখনই তার বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্চি। কি—যা ক'রবে, একটু শীগ্‌গীর শীগ-গীর—ও কি! কান্না রেখে আমায় বল এখন—"

আমার কৌতুহল হ'ল। সেখানেই দাঁড়িয়ে মেয়েটির তখনকার সঙ্কটের অবস্থাটা দেখতে লাগলাম। বাবুটি অনেক সাধ্য সাধনাতেও তাকে কিছু বলাতে না পেরে নিজের কাজের তাড়ায় সেখান থেকে চ'লে যেতে বাধ্য হ'লেন। কিন্তু একটি ছুটি ক'রে সেখানে লোকের ভিড জমতে বেশী দেরী হ'ল না। ঝাঁ ক'রে আমি মনুয়াকে তার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সে গিয়ে আমার কথা বলাতেই মেয়েটি সেখান থেকেই আমার দিকে ফিরে তাকালে, অমনি আমিও হাত তুলে তাকে ডাক-লাম। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন ভয়ানক বিপদ থেকে উদ্ধার

পেয়েই এসে আমার একেবারে কোলের কাছটি ঘেঁসে দাঁড়ালো।

আহা! কি কাতর চাহনি—আর কি করুণ বেদনায় ভরা মুখখানি তার! কোন কথা না জিজ্ঞেস্ ক'রেই একেবারে গাড়ীতে তুলে নিজের কাছটিতে বসিয়ে পাশের ইলেকৃট্রিক পাখার চাবিটা খুলে দিতেই ঝির ঝির ক'রে বাতাস এসে তার রুক্ষ এলো-চুলের রাশ নাচিয়ে দিতে লাগ্ল।

ডাক্তার বাবু তখনও ফেরেন নি। আমি কেমন ক'রে তার সঙ্গে আলাপ সুরু করি তাই ভাবতে ভাবতে তার কপালের সম্মুখের চুলগুলি ফু ফাঁক ক'রে সরিয়ে দিচ্চি আর দেখচি তার অনিন্দনীয় রূপের লহরী। হাঁ বিধাতার তন্ময় হ'য়ে নির্জ্জনে ব'সে মনের মতন ক'রে আঁকা ছবি খানি বটে। খুঁৎ? না কোথাও কোন খানে এতটুকু নেই, একেবার উপন্যাসের সেরা নায়িকা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া তরুণীর ঢল ঢল সুকোমল লাবণ্যের চাইতেও এ যেন বেশী সুন্দরী। কিন্তু কি কপালের জোর—দুনিয়াতে দুঃখীও বুঝি এর চেয়ে আর কেউ নেই। ছেঁড়া খোঁড়া দশ জায়গায় তালি দেওয়া কাপড়-টুকু তার পরনে তাও আবার হাঁটুর নীচু পর্য্যন্ত কোন রকমে পৌঁছেচে। আহা বেচারা! কিন্তু তবু এ কি আশ্চর্য্য সিঁথিতে সিঁদুর! স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রীর এ কি নিদারুণ ভাগ্য বিপর্য্যয়!

কি ব'লে কথা আরম্ভ করি তার সঙ্গে, ঠিক করতে না পেরে প্রথমেই ব'লে ফেললাম "তোমার মুখখানি বড় শুকনো দেখাচ্ছে, অনেকক্ষণ খাওয়া হয়নি বোধ হয়, কিছু খাবার খেয়ে তারপর কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে, কি বল ?"

বাঁশরীর আওয়াজকে হার মানিয়ে দিয়ে সে প্রথম কথা কইলে "আমার এখন মোটেই খেতে ইচ্ছে নেই ; আপনি একটুও ব্যস্ত হবেন না। দরকার হ'লে আমি চেয়ে নেব ।"

"না ভাই, তোমাকে না খাওয়ালে তুমি বাঁচবেনা ; আগে আমার অনুরোধে কিছু খাও, তারপর যখন দরকার হবে, চেয়ে খেয়ো।"

"না না আপনি কেন এত ব্যস্ত হচ্চেন ? খিদে একটুও নেই, নইলে খেতে আর—"

"দোষ কি ? ব'লাচ এত ক'রে, অনুরোধেও না হয় ঢোঁকটা গেল একটি বার ।"

"আচ্ছা দিন খুব সামান্য ক'রে ; এক আধটা মিষ্টি ছাড়া আর কিছু দেবেন না। আমার এখন খেতে মোটেই ইচ্ছে নেই।"

"আচ্ছা আচ্ছা।"

মহুয়াকে জল দিতে ব'লে আমি একটা মাঝারি ডিসে

আমাদের যা ছিল সব রকমই খাবার কিছু কিছু ক'রে সাজিয়ে তার সামনে ধ'রতেই সে "অত খাবনা অত খেতে পারব না" ব'লে অনেক আপত্তি তুললে। আমিও ছাড়বার বান্দা নই। একটা মিহিদানা জোর ক'রে তার মুখে গুঁজে দিতেই ডাক্তার বাবু এসে গাড়ীতে ঢুকলেন আমি তাঁকে তাড়াতাড়ি ব'ললাম "তুমি পাশের গাড়ীতে যাও না; এরপরে আসবে এখানে, কিন্তু ততক্ষণে গাড়ী চ'লতে সুরু ক'রে দিলে।

লজ্জায় মেয়েটি ঘোমটা দিয়ে এক কোণ ঘেঁসে ব'সলো, খাবার সমেত ডিসটা রইল তার সামনে প'ড়ে। সে যত না অপ্রস্তুত হ'ল, তার চেয়ে আমি, আর আমার চাইতেও বেশী রকম বোকা ব'নে গেলেন আমার নেহাৎ নির্দোষ স্বামীটি! বেচারা কিছুই জানে না অথচ যেন গাড়ীতে ঢুকেই চোর।

খাবারটা কোলের ওপর রেখে ব'ললাম "লক্ষ্মী বোনটী আমার খাও, এইত আমি তোমায় আড়াল ক'রে ব'সে রয়েছি, উনি এদিকে একটুও নজর দেননি। লজ্জা ক'রোনা খাও দিদিটি আমার!

ডাক্তারবাবু তখন অন্যদিকের বেঞ্চিতে ব'সে জানলায় মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিলেন আমিই তাঁকে প্রথমে জিজ্ঞেস্ করলাম "কি গো হ'ল কিছু সন্ধান?"

তিনি গাড়ীর শব্দে কথাটা বোধ হয় ভাল ক'রে শুনতে পাননি। তাই কোনই জবাব পেলাম না। আমিও মেয়েটির খাবার অসুবিধা ভেবে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ক'রলাম না। পেছন ফিরে দেখি ২।১ টা মিষ্টি খেয়েই সে জলের গ্লাসটা হাতে ক'রে তুলেচে; অনুরোধ ক'রেও কোন ফল হ'লনা, জলটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ ক'রে গ্ল্যাসটা আর ডিসটা ধুতে যাচ্চে দেখে আমি সেগুলো কেড়ে নিয়ে মনুয়ার হাতে দিলাম। তার পর একটুখানি হেসে তার বাঁ হাতটা আমার ডান হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নাড়া দিতে দিতে ব'ললাম "আমার স্বামীকে একটুও লজ্জা করবার নেই তোমার ভাই। উনি বড্ড সাদাসিদে মানুষ। এই একটিবারও কি এদিকে চেয়ে থাকতে-দেখ্‌লে? এখন এস গল্প করা থাক্। হুঁ ভাল কথা। তুমি কোথা যাবে বল। আমরা সেখানেই তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাব। একটুও ভয় ভাবনা ক'রোনা। নিজের বোনের মত ভাবলে আমি খুব খুসি হব ভাই।"

"যাব যে কোথা, তাই আমার একটা মস্ত ভাব্‌বার কথা। অনেক জায়গায় যাব ব'লেইত বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম গেলাম ও অনেক জায়গায়, কিন্তু আবার হ'লও না কোথাও যাওয়া।"

"সঙ্গের লোক টোক সব—"

"সঙ্গের সবের মধ্যে আমিই একা। কেউ ছিলও না সঙ্গে কোনদিন কেউ আসেওনি। এমনি ক'রেইত চ'লেচি,—দেখি এখন ভাসতে ভাসতে আর চরায় ধাক্কা-খেতে খেতে আবার কোন কূলে কূল পাই "

"তুমি যে ভাস্‌তে ভাস্‌তে আর ধাক্কা খেতে খেতেই আসচ তা তোমার মুখের দিকে চেয়ে বেশ বোঝা যায়। আমি অবিশ্যি বুকের ব্যথা তোমার কোনখানে আর কতখানি তা জানিনে তবু সে যে যেমন তেমন ব্যথা নয় তা বুঝতে পারছি। তবে আর কোন কথা না, উপস্থিত বরাবর আমাদেরই সঙ্গে চলো। তারপর ভবিষ্যতের ভাবনা দুটো দিন র'য়ে ব'সে ভাবলেও ক্ষতি হবেনা দিনত ব'য়েই যাচ্চে। যাক্‌না আরও দুটো দিন কি বল ?"

আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে সে ঘাড়টি হেঁট ক'রে রইল। ডাক্তারবাবু তখনও তন্ময়। তার দিকে চেয়ে আমি যখন ব'ললাম "দেখছ ভাই ব্যাপার খানা ভদ্রলোকের ? যেন কতই ভাবে বিভোর !" সেও মাথা তুলে তাঁর দিকে চেয়েই যেন চমকে উঠল। কি জানি কেমন একটা অশ্বস্তির ভাব দেখলাম তার। অবশেষে ব'ললে "আপনার স্বামীকে জিজ্ঞেস করুন না আর কতক্ষণ আমাদেরকে গাড়ীতে থাকতে হবে।"

আমি তার কথামতই ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস্ করলাম "ওগো! শুনচ? আর কতক্ষণ আমাদের গাড়ীতে থাকতে হবে?"

ডাক্তারবাবু মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলেন "কেন নতুন যাচ্চ নাকি জাননা কতক্ষণে আমরা পৌছবো?" আমি আর কোন কথা বলার অবকাশ পেলাম না। অতি মাত্রায় বিস্মিত হ'য়ে গেলাম আমাদের এই হঠাৎ পাওয়া অতিথিটির কাণ্ড দেখে। সে একেবারে গলায় আঁচল দিয়ে আমার স্বামীর পায়ে মাথা ঠুকিয়ে প্রণাম ক'রে তাঁকে "ভাল আছেন?" ব'লে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল তাঁরই সামনে—জবাবের প্রত্যাশায়।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় স্বামীও দেখি তার মাথায় হাত দিয়ে আশার্ব্বাদ ক'রে অপ্রত্যাশিত আনন্দে বিভোর হ'য়ে ব'লে উঠলেন "আঁা রেণু! কোত্থেকে তুমি এলে? এমন ভাবে যে তোমাকে দেখতে পাব তা ত একদিনও ভাবিনি আমি! কেমন ছিলে? একি! এমন মলিন বেশে আজও আছ তুমি? আমি মনে ক'রেছিলাম উমা বুঝি আর কোন স্ত্রীলোককে অসহায় সঙ্গীহারা দেখে গাড়ীতে তুলে নিয়েচে।"

"আমিও কি অসহায় নই দাদা? উনি ত আর আমাকে চেনেননি এর আগে। অসহায় দুঃখিনী ভেবেইত মায়ের পেটের বোনের চেয়েও বেশী আদর যত্ন ক'রে আমাকে খাইয়েচেন—আমার কষ্টে কতনা চোখের জল ফেলেচেন।"

"সে বেশ। যা হবার হ'ল। আর ত এখন তুমি অসহায় নও দিদি। উমা! শীগ্‌গীর রেণুকে তোমার একস্থট জামা কাপড় বের ক'রে দাও। আমার বোনের মতন ক'রেই ওকে সাজিয়ে নিয়ে চল।"

হাত ব্যাগটা খুলেই তাড়াতাড়ি সাদাসিদে রকমের একখানা শাড়ী আর একটা জ্যাকেট দিলাম রেণুকে প'রতে। এর চাইতে ভাল জিনিষ সে নিতে চাইলে না। গহনা, মাত্র দুগাছি চুড়ি আমার হাতেরই, খুলে দিলাম। অন্য কিছু নিলে না ব'লে। বেশী দামী জিনিষ দিয়ে সাজালে যেন এ অপরূপ রূপের অপমান করা হ'ত। খোঁপা এলো করাই ছিল—তাই থাক্‌লো, গাড়ীতে আর বাঁধার স্থবিধে হ'য়ে উঠল না। এই দিব্য শ্রী দেখে আমি তার চিবুকে হাত দিয়ে আদর ক'রতে যাচ্ছি, এমন সময় ডাক্তারবাবু ব'লে উঠলেন "রেণু, তোমার বউদিকে একটা নমস্কার কর এবারে। আহা! বেচারা তোমার পেছনে খেটে খেটে সারা হ'য়ে গেল যে। কি উমা! সত্যি একটা নমস্কার তোমার রেণুর কাছে পাওনা আছে না?"

"যাও তুমি, আর ন্যাকামী ক'রতে হবেনা। তা আছেইত নমস্কার পাওনা। দাদা হয়ে এতক্ষণ ত ভুলেও বোন্‌টির দিকে তাকাওনি একটিবার। ভাগ্যিস্ ছিল এই উমি পোড়ারমুখী, তাই খাইয়ে দাইয়ে বোনের প্রাণটাকে ধ'রে রেখেচে,

নইলে রেণু তোমার এতক্ষণ পেত্নী হ'য়ে চিঁ চিঁ ক'রতো।"

দেখি সত্যি সত্যিই রেণু দুহাতে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিচ্ছে। আমি জড়িয়ে তাকে আমার বুকের কাছে টেনে নিলাম।

রেণুকনার কথা।

(ক)

এইযে তিন তিনটে দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল আবার এখানে এসে, কিন্তু আমার সার্থকতাটা ত কই তেমন পেলাম না। অবিশ্যি আমার অন্তরেব নিভৃততম প্রদেশের যে সার্থকতা তা—ই পাইনি নইলে বাইরের সার্থকতা হিসেবে আশার ঢের বেশী বেশী পেয়েছি।

এত যত্ন এত আদর ভালবাসা পরের কাছে কেউ কোন কালে পেয়ে থাকে? না কেউ পাচ্চে আজও? নিখিল দা আর উমা বউদি দুজনেরই হ'য়ে দাঁড়িয়েচি আমি ঠিক আঁধার ঘরের মানিকটি। কেমন ক'রে কোথায় রাখবে এ যেন খুঁজেই পায় না তারা। কিন্তু দুঃখ আমি ভোগ করচি ঠিক তেমনি ভাবে,

যেমন সোনার খাঁচায় নবনীত সুকোমল ফল খেয়ে তোতাপাখী আপনাকে ভাগ্যবান মনে করে—আর যে আনন্দ ও দুঃখ নিয়ে তারা পালন কর্ত্তার আদেশে গান গায় শিষ্ দেয়।

হাঁরে! হতভাগিনী, বাড়ীতে থাক্‌তে তোর যেন চারদিকে কূল কাঠের আগুন জ্ব'লে উঠেছিল তাই শান্তি পেতে রাস্তায় অনাথিনীর বেশে বেরিয়ে প'ড়েছিলি, পেছন ফিরে তাকাতেও সময় পাসনি একটিবার, ভুলেও পলকের দেখাটুকু দেখিসনি, যে কত বড় বিপদের দল এক সঙ্গে তোর পেছু নিয়েছিল সেদিনে। এই যে গাড়ীর চাকার মতন ঘুরে ঘুরে হয়রান হ'য়ে এলি এতদিন, কি লাভ হ'ল তোর এ ঘোরায়? একদিন যেখানে এসেছিলি কপালের সুখ-দুঃখটা যাচাই ক'রে নিতে, আবার ঘুরণ পাক্ খেতে খেতে সে খানটিতেই ফিরে এলি; কিন্তু যাচাই হ'ল তোর কি, না নিছক দুঃখটা! সুখের জমার ঘরে যে অঙ্কের রেখাপাতও হয় নি কোন দিন।

সেদিন বিকেল বেলা বাগানের ছোট বেঞ্চিটার ওপর ব'সে ভাব্‌ছি নিজের অতীত জীবনের করুন ঘটনার কথা গুলো, এমন সময় নিখিল দা আর তার পেছনে উমা বৌদি এসে হাজির হ'ল। উমা ত এসেই আমার গলাটি ধ'রে পাশের জায়গাটুকু দখল ক'রে নিলে আর নিখিল দা সম্মুখের আর একটা বেঞ্চিতে ব'সে একটা

নতুন কি ডাক্তারী বইএর পাতা ওল্টাতে লাগলো। বাগানে বেড়াতে এসে এই বই খোলা উমার বড্ড বেশী অপছন্দ। সে চট্ করে উঠে গিয়ে বই খানা নিখিলদার হাত থেকে টেনে নিয়ে সটান্ দিলে ছুঁড়ে একটা কমিনী গাছের ঝোঁপের ভেতরে। দিয়েই কৃত্রিম রাগে মুখখানা যথাশক্তি গম্ভীর ক'রে আমায় ব'ললে "দেখলি ভাই রেণু? বাবুব দিব্যি গালা কেমন? এই সেদিন বলা হ'ল বাগানে এসে আর বইএর নামও মুখে আনব না—না —না। উঃ কি সাংঘাতিক লোক! একবার দুবার নয় একেবারে তিন সত্যি ক'রে আবার সেই ছাই পাঁশ নিয়ে—উঃ কি নিখাক এই পুরুষ জাত গুলো! কথার বেঠিক্ যেন মায়ের পেট থেকে বেরিয়েই মজ্জাগত। বাগানে আসবার আগেই একটা কথা হ'ল আমার সঙ্গে আর যেই এলেন অমনি বাস্ একেবারে সে কথার মস্তকটি পর্য্যন্ত চর্ব্বিত চর্ব্বন ক'রতে বাকি রাখলেন না!"

মহা অপ্রস্তুত হ'য়েই নিখিলদা ব'ললে "কি কথা হ'ল সেটা বল আগে।"

"কি কথা হ'ল সেটা বল আগে!" ও হরি! আবার ব'লতে হবে নতুন করে? ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আর ও বিদ্যেটা চালিও না বেশী দিন—দেশ উজোড় হ'য়ে যাবে তা হ'লে দুদিনে।"

আমি আর বেশী চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস

ক'রলাম, "কি বিদ্যে বউদি, যাতে দেশে উজোড় হ'য়ে যায়?"

"কেন এই যমের পাইকেরী। ডাক্তারী লো! ডাক্তারী। বুঝলিনি? উনি কি আর ডাক্তারী করেন? করেন যমের পাইকেরী—লোক মেরে যমপুরীতে চালান দেন। নইলে ঐ মানুষ, যাঁর এক মিনিট আগে কি বলেন মনে থাকে না তিনি আবার রোগের চিকীৎসে ক'রে বেড়ান! যদি ঠাওরালেন কারও জ্বর বিকার, কিন্তু ওষুধ দিবার বেলায় দিলেন চুল পাকার। হয়ত দাঁত তুলতে গিয়ে কারও পায়ের বুড়ো আঙুলটি দিলেন সই ক'রে কেটে, নাঃ আমার দেখ্‌চি কোন দিন নিজেকেই যন্ত্রপাতি নিয়ে শান্ দিতে ব'সতে হবে, নইলে আর ভদ্রতা থাকবে না। "বল না তোমার সে কথাটা কি?"

"তোমার দুই দুগুনে চারটি পায়ে পড়ি, দোহাই, আর কথা ক'য়ো না। হাঁ গো! তোমার কি হ'ল বল দিকিনি? এই আধ মিনিট আগে তোমাকে ব'লে এলাম, বাগানে গিয়েই আজ রেণুর সব কথা গুলো আগাগোড়া শুন্‌তে হবে, আর তুমি কিনা এরই ভেতর সে কথাটা এক নিশ্বেসে খেয়ে দিলে? আবার বলছি দোহাই! আমার এই মাথাটা দেখচো? এরই দিব্যি, এবারে আর অত বড় দায়ীত্বওয়ালা কাজ ঐ চিকীৎসে করা ওটা ছাড় তুমি।"

নিখিল দা অত্যন্ত অপ্রস্তুতের মতই আমার দিকে চেয়ে ব'ললে "রেণু! তোমার কথা গুলো সব বল ত আজ,ওর ভারী শুনতে সাধ হয়েচে! আর আমিও ত তেমন ভাল ক'রে কিছু শুনিনি আজও।"

আমি ব'ললাম "দাদা! তোমরা শুনতে না চাইলেও আমারই এতদিন উচিত ছিল সব বলা, তবে মনটাকে এখনও তেমন ভাল ক'রে সামলাতে পারি নি ব'লে বলা হয় নি। কিন্তু আজ ত আর তেমন বেশী বেলা নেই। আজই শুনবে? বেশ শোন, তোমার হাতে ত তেমন বেশী কাজ নেই?"

উমা ব'ললে "হাঁ হাঁ সেই ভাল, সকাল সকাল ঘরে গিয়ে আর কি রান্না হওয়া যাবে, তার চেয়ে এখানে ব'সেই—কিন্তু রেণু! তোমার যদি খুব কষ্ট হয় তা হ'লে এখন আর ব'লে কাজ নেই ভাই।"

"না না দুঃখ কষ্টের কথা নিজের লোকদের কাছে না জানালে যে মনটা হাল্কা হয় না দিদি।"

আমি আরম্ভ করলাম। আশ্চর্য্য রকমের বিয়ের দিনটির কথাই তাদের সংক্ষেপে জানিয়ে, যেদিন আমি বাপের বাড়ী ছেড়ে স্বামীর পায়ে স্থান পাবার আশায় বেরিয়ে পড়ি সেইদিন থেকে সব কথাই বলতে সুরু করলাম।

*　　　*　　　*　　　*

আমার এ ক্ষুদ্র বুকখানির ভেতর এ সুখের আশা এক মুহূর্ত্তের তরেও ঠাঁই পায় নি যে স্বামী আমার স্বয়ং উপযাচক হ'য়ে এক-

দিন এই হতভাগীকে তাঁর পায়ের গোড়ায় জায়গা দিতে আমারই বাবার কাছে এসে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রবেন। কিন্তু তা তিনি এসেও ছিলেন। এক রাত্রির কয়েক ঘণ্টার জন্য তিনি এ দাসীকে দেখেছিলেন, তবু তিনি দয়াময়, তাই নিজগুণে তাকে পায়ে স্থান দিতে এতটুকু কৃপণতা দেখান নি। মা বাপের চরম শাসন, সমাজের নির্ম্মম চোখ রাঙানী কিছুতে তাঁকে বাধা দিতে পারে নি।

কিন্তু আমার মন্দ কপাল যে ভাল হবে না কোন দিন, সেটা বাবা ভাল ক'রেই বুঝেছিলেন বোধ হয়; তাই স্বামীকে আমার চূড়ান্ত অপমান ক'রে তিনি বাড়ীর ত্রিসীমানা পার ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। হায় হায়! স্বামী ছেড়ে স্ত্রীর যে টাকার গদিতে শুয়েও শান্তি আসে না, বাপ মায়ের স্নেহের কোলে ঘুমিয়েও যে দুঃস্বপ্নের অশান্তিতে সব ঘুমের নেশা টুটে যায়, সেটা ভাল ক'রে বুঝতে পেরেই এক ভরা বাদলের রাতে ঝড় বৃষ্টি মাথায় ক'রে ঝিঁঝিঁর ডাক কানে শুনতে শুনতে আমি খিড়কীর দরজা খুলে অনির্দ্দিষ্ট অচেনা পথের দিকে রওনা হ'য়েছিলাম। স্বামী কোন রকমে সেদিন আমাকে তাঁর ঠিকানাটা জানিয়ে এসেছিলেন। অভাগিনী পতিপদ কাঙ্গালিনী আমি সেই একটুমাত্র ক্ষীণ আলোর রশ্মি লক্ষ্য করে নদী যেমন কোন বাধাই গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে অবাধ গতিতে ছুটে যায় সাগরের পানে, আমিও ঠিক তেমনটি এসেছিলাম।

পাপীর পাপ চক্ষুকে উপহাস করে, অনাহারের তীব্র জ্বালাকে তুচ্ছ করে আমি চলেছি, দিন রাত্তির সেই তীর্থের পথে, উদ্দেশে সেই সে পীঠস্থানটুকুর, যেখানে আমার জনম জীবন ধন্য করা সব আরাধনার ধন আছেন।

দরিদ্রতা যতদূর শক্তিতে পেরেছিল আমায় টিপে মারতে কসুর করেনি; কিন্তু নাছোড়বান্দা আমি। মনে তখন আমার পবিত্র সতীত্বের আলো জ্বলে উঠেচে—বিপদ, দারিদ্র, কষ্ট কে দেখাবে ভয়? দীর্ঘ পাঁচদিনের অনাহার অনিদ্রা স'য়ে স'য়ে ঠিক বাঞ্ছিত মন্দিরের দরজায় এসে তারই শক্ত লোহার ভারী কপাট টায় মাথা ঠুকে আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে সেই মন্দির দুয়ারেই অজ্ঞান হ'য়ে লুটিয়ে প'ড়লাম।

পূর্ব্ব জ্ঞান যখন ফিরে পেলাম তখন দেখি আমি মন্দিরে পৌঁছুতে পারিনি। সব শ্রম আমার পণ্ড হ'য়েচে। জীবনে ধিক্কার এল। হায়! তবু বেঁচে আছি! এ নিবেদন ক'রে দেওয়া ছার দেহটাকে দেবতার পায়ের গোড়ায় অঞ্জলি দিতে না পেরেও আমি বেঁচে রইলাম—কী সুখের কল্পনায়—মাত্র এই কথাটাই কেবল মনে আসতে লাগলো। জ্ঞান অজ্ঞানের মাঝামাঝি কুহেলিকার ভেতর দিয়ে জানিনা কার এবং কিসের প্রেরনায় নিখিলদা! তোমাদেরই ঘরের আলমারী খুলে বিষ খেতে গেছলাম আমি—নষ্ট করতে আমার এ ব্যর্থ নিরাশাকাতর অভিশপ্ত জীবনটাকে। কিন্তু

তুমি তা দাওনি। জোর ক'রে ধ'রে রেখেছিলে আমায়, শুধু জীবনটার দুর্ব্বিসহ বেদনাকে আরও দুর্ব্বিসহ করবার জন্যে। আজ সে চেষ্টা তোমার কতকটা সফলও হ'তে চ'লেচে, আমি তেমনি—ঠিক তেমনি আজও স্বামি সন্দর্শন কাঙালিনী অভাগিনী রেনুকণাই আছি। আজও দেশে দেশে তেমনি ক'রে খুঁজে বেড়াচ্চি সেই মূল আরাধনার দেবতাকে পাবার প্রত্যাশায়।

যখন আমারই অনুরোধে তুমি দেশে গেলে নিখিল দা! সঁপে দিয়ে আমাকে তোমাদের সেই নতুন ডাক্তার বাবুর হাতে; মনে পড়ে? সেদিন থেকে প্রতি পলে পলে আন্তরিক সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে শুধু মৃত্যুর পথটাই খুঁজেছিলাম আমি। কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা হয় না। কাজেই কিছুতে মরতে পারলাম না তখন। ম'লে এসব জ্বালা পোয়াত কে? অনন্যোপায় হয়ে এবং কতকটা যেন ইচ্ছে করেই নতুন ডাক্তার বাবুর বাসাতেই আমি থেকে গেলাম, কারণ যদি কখনও স্বামী তাঁর নির্দ্দিষ্ট মন্দিরটিতে ফিরে আসেন।

ঝির কাজের যে সব দায়ীত্ব আমারও এখানে ঠিক তাই ছিল। সারাটিদিন ঘর ধোয়া বাসন মাজা ছেলেকে দুধ খাওয়ান এই সব কত কি কাজেই না আমার দিনগুলি টুক্ টুক্ ক'রে কেটে যেত। তুমি ব'লে গেছলে দাদা! রতনপুরে যেতে, কিন্তু চেষ্টা ক'রেও তা যেতে পারিনি আমি—ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বাধা দিয়াছিলেন বলে।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন আমার এ বাসাও ভাঙলো। ওঃ সেদিন কি ভীষণ দুর্য্যোগ! একদিন যেমন দুর্য্যোগ মাথায় করে ঢুকেছিলাম এদেশের ভেতর সেদিনও বেরুতে হল তার বাড়া দুর্যোগ নিয়ে। সে রাত্রির ভীষণ কষ্টের কথা মনে হলে হাত পা যেন বুকের ভেতর সেঁধিয়ে যায়।

ডাক্তার বাবুর ছোট মেয়ে আশার গলার মটরমালা চুরির অপবাদটা চাপ্‌ল একাদন আমারই মাথায়। আজ সেই কথাটাই আমি ভাবচি নিখিলদা! যে লোক বাপের অগাধ টাকা পয়সা বিপুল সোণাদানা ধূলি মুষ্টির মতই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল একদিন—সেই লোক কিনা সামান্য একছড়া সোণার হার—ইচ্ছে ক'রলে যা একদিন সে রাস্তার ভিকিরী ডেকে দিতে পারতো—তাই চুরি ক'রেচে! ভগবান কত ভাবেই না মানুষকে পরীক্ষা কর তুমি।

আমি ডাক্তার বাবুর গিন্নীর খ্যাংড়ার চোটেও যখন কিছুতে মটরমালা বের ক'রে দিতে পারলাম না, তখন সেই অশ্রান্ত বর্ষা বাদল রাতের মাঝখান দিয়েই আমাকে পা বা'ড়াতে হ'ল নতুন আর এক আশ্রয় খুঁজে নিতে।

চ'লে এলাম বরাবর ষ্টেসনে। কাকেও কিছু না জিজ্ঞেস ক'রে সামনে যে ট্রেন পেলাম তাতেই চেপে প'ড়ে কিছুদূর যেতেই টিকিট চেকারের অত্যাচারে মাঝখানে এক জায়গায়

নামতে হ'ল। ফের সুরু হ'ল সেই আগের মত অনাহারের পালা। দুটো দিন সেই বড় ষ্টেশনটার মেয়েদের ঘরের একটি কোনে শুয়ে ব'সে কাটিয়ে দিয়ে একখানা যাত্রিদের গাড়ী ধ'রে চ'ললাম আবার আর একটা অনির্দ্দিষ্ট দেশে আর এক অজানা বিপদের মুখে ঝাঁপ দিতে। যেতে যেতে খেয়ালের মাথায় নামলাম কোথায় গিয়ে জান উমা বউদি? নামলাম আমার শ্বশুর বাড়ীর গাঁয়ের ষ্টেসনে। তারপর মন্ত্র চালিতের মতই সটান গিয়ে উঠলাম সেই নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থের দ্বারদেশে। পরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু সেখানকার লোকে আমায় তাতেও বাধ্য করালে। বিনিময়ে যা পেলাম মহালাভ ভেবে তাই অর্থাৎ গলাধাক্কার তাড়া খেতে খেতে একটু জিরিয়ে নেবার মতলবে আমাদের সেই বাড়ীখানায়—যেখানে কিছুদিন বাস ক'রেছিলাম আমরা—সেইখানে গিয়ে ব'ললাম। উঠানের যে জায়গাটুকুতে আমাদের সেদিনের অশুভ বিয়ের ছাদ্‌নাতলা হ'য়েছিল ঠিক সেই টুকুতেই ব'সে প্রাণের জ্বালা জুড়োতে কত কান্নাই না কাঁদলাম। চোখের জমাট বাঁধা অশ্রু যত টপ্ টপ্ ক'রে ঝ'রে আমার বুকটা ভাসিয়ে দিতে লাগ্‌ল, আঃ বাঁচলাম! কান্নায় কতই না সুখ পেয়েছিলাম সেদিনে!

খ

সাত জায়গায় তালী আঁটা ময়লা কাপড় প'রে নিতান্ত দরিদ্রা অনাথিনীর মতই, শুয়ে ব'সে কখনও বা তাঁকে পাওয়ার দিনের সুখের কথাটা ভেবে ভেবে আমি একটি বেলা সেইখানটিতে প'ড়ে থাকলাম।

মাত্র ২।৩ দিনের মতই সে দেশে আমরা বাস ক'রেছিলাম, তাই কারও সঙ্গে তেমন আলাপ পরিচয় ও কিছু ছিল না। কিন্তু না থাকলে কি হবে; একটি দুটি ক'রে পাড়ার পাঁচজন কৌতূহলী নর নারী তারা ত আমাকে ঘিরে সে বাড়ীতে ভিড় ক'রতে কাসুর ক'রলে না। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো আবার মাঝে মাঝে গায়ে ঢিল ছুঁড়তে কখনও বা থুথু দিতেও সুরু করে দিলে।

একে মনের ভেতর দিবানিশি তুষের আগুন জ্বলছে; তারই জ্বালায় অস্থির হ'য়ে ছট্ ফট্ ক'রছি তার ওপর এই সব নানা অত্যাচার—সহ্যেরও ত একটা সীমা আছে নিখিলদা? আমি আর চুপচাপ না থেকে উঠে দরজার কাছে পা বাড়াতে যাচ্ছি এমনি সময় একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোক ব'লে উঠ্‌ল "কি রাজ-যোটকই হ'য়েচে মা! সে ছোঁড়াও এই বউ বউ ক'রে পাগল হ'ল। বাপের এত বড় বাড়ীঘরপাট্ এও নাকি কেউ ছাড়ে?

আহা! হতভাগা হাতের লক্ষ্মী দুপায়ে ঠেলে চ'লে গেল কোন্ দেশে। আবার এ বউ ছুঁড়ীও দেখচি সেই হতচ্ছাড়া-টারই পেছুনিতে এখান অবধি ধাওয়া করেছে। মা, মা, কি ডাইনীই লেগেছে ছোঁড়ার পেছনে! তবু যদি বিয়ের মতন বিয়ে হ'ত, ধাপ্পাবাজী ক'রে বামুনের ছেলের সঙ্গে কিনা বিট্‌লে বুড়ো কায়েতটা এক ষোল বচ্ছুরি কায়েতনি জুটিয়ে দিলে!"

আমি আর দাঁড়ালাম না সেখানে। ছেলের দল তখন আমার কাপড় খানা টেনে টেনে আরও ছেঁড়ার ভাগ বাড়িয়ে দিতে লাগলো। রাস্তায় চ'লতে দেখে জমিদার বাবুর বাড়ীর চাকর দরওয়ানেও আমার দিকে চেয়ে অকথ্য ভাষায় ঠাট্টা তামাসা ক'রতে লাগলো, কিন্তু কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা আমার শ্বশুরের। নিজের পুত্রবধুর ওপর এ অত্যাচার চোখের সামনে দেখেও তিনি একটি কথাও ব'ললেন না।

ক্লান্ত পা দুখানা যেন আর চ'লতে চায় না। মানুষের শরীর ত? গ্রামের শেষে একটা বুড়ো অশথ্ গাছের তলায় ছেঁড়া আঁচল টুকু বিছিয়ে শুতেই রাজ্যের ঘুম এসে আমার চোখের পাতা জড়িয়ে চেপে ধ'রলে। তখন বিকেল বেলা। সোনালি রদ্দুর গাছের পাতা থেকে যেন আমারই প্রতি এ নিষ্ঠুর অত্যাচার আর চোখে না দেখতে পেরে পৃথিবী থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম মনে নাই। জেগে দেখি অন্ধকার!

চারদিকে বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার প্রচণ্ড দৈত্যের মত মুখ বাড়িয়ে আমায় গিলে খেতে আসচে! মাথাটা আমার যেন কেমন ধারা ঘুরে উঠ্‌লো। চোখ বুজে প্রায় আধ ঘণ্টাকাল ভাবলাম আমার তখনকার সে দারুণ শোচনীয় অবস্থার কথাটা। এখন যাই কোথা? করি কি? এ তেপান্তরের মাঠ পার হই কেমন ক'রে? মাঝে মাঝে এক একটা ফাঁকা দম্‌কা বাতাস এসে হাহা করে কাণের কাছে উপহাসের বিকট হাসি হেসে যায় আর আমার পায়ের তল থেকে মাথাটা পর্য্যন্ত যেন ভয়ে গরম হ'য়ে ওঠে।

ভাবলাম কত অসহায় কত দুর্ব্বল এ অধম নারী জাতিটা।—নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা কি এতটুকু নেই তার! বেশ বুঝলাম যে স্বামী যদি "এস আমার পেছনে" ব'লে চোখের আড়ালে যান তা হ'লে তার দশদিক অন্ধকার; যতক্ষণ হাত ধরে না নিয়ে যাবে ততক্ষণ সাধ্য কি তার যে একটি পাও এগিয়ে যায়। পা বাড়িয়েচ কি অমনি হাজার বিপদ এক সঙ্গে এসে তোমার সে বাড়ানো পা টাকে কামড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিয়েচে। উপায় নাই। ওরে সহায়হীনা অভাগিনী তোদের উপায়নাইরে পথ নাই।

প্রায় সমস্ত রাত্তিরটাই কেটে গেল সে অশথ্‌ গাছ তল'য়। ঘণ্টা খানেক রাত্তির থাকৃতে আমি উঠে চ'লতে স্বরু করলাম—কি ভীমরতিই আমার এল! ষ্টেশন থেকে যে পথ ধরে দিনের বেলায় গ্রামে এসেছিলাম, সে পথ আর কিছুতে খুঁজে পেলাম না।

ঘুরতে ঘুরতে প্রায় তিন মাইল হেঁটে রেলের পুলে উঠলাম কিন্তু ষ্টেসনের নাম গন্ধ—দুধারে তাকিয়ে কিছুই টের পেলাম না।

বেলা প্রায় যখন ৯টা তখন আমার পথ হাঁটার শেষ হ'ল। একটা ষ্টেশনে এসে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করতেই একখানা গাড়ী পেলাম। ভগবানের নাম তখন মনে পড়েনি—সেই এক রাত্রির দেখা পরমগুরুর দেবমূর্ত্তি মনের ভেতর কতই না রঙ বেরঙে সাজিয়ে তাঁরই সেই রাতুল চরণ দুখানি মনে এঁকে নিয়ে কপর্দ্দক হীনা হয়েও সাহস করে আবার গাড়ীতে চাপলাম।

বরাবর চলে এলাম কোথাও কিছু বাধা পাইনি। সে দিনে চেকার টেকারও কেউ আসেনি আমাদের গাড়ীতে : আস্তে আস্তে দিনের আলো নিভে গেল আবার রাত্রি এল, আমি তখনও অনাহারে। ছিন্নবেশা দরিদ্রার দুঃখে ত আর সবার প্রাণ গলে না। ভগবান যার ওপর বিরূপ তার কোন দিকেই কিছু পথ নেই। দু একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলেও কেউ উমা বউদির মত খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করেনি। আর আমার তাতে কিছু আগ্রহও ছিল না। কিন্তু পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। দুর্গন্ধ পচা ডোবার এক গণ্ডুষ জল পেলেও যে প্রাণটা তখন রক্ষা হয়। গাড়ী আসানসোলে এসে থামতে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম কত লোকে খাবার খাচ্চে জল খাচে। আমাদের গাড়ীর ঠিক সামনে না হ'লেও একটু বাঁ দিকে একটা জলের কল

আছে দেখলাম, কিন্তু সেখানে তখন ভয়ঙ্কর ভিড়। লোকজন স'রে গেলেই চট্ ক'রে একটু জল খেয়ে আসব এই মতলব ক'রে আমি সেদিকেই চেয়ে বসে থাকলাম। দেখতে দেখতে একটির পর একটি করে সব লোকেই চ'লে গেল আমিও অবসর বুঝে ঝাঁ ক'রে নেমে পড়লাম গাড়ী থেকে। কলের কাছে মুখটি পেতে দাঁড়াতেই পোঁ করে বাঁশী বাজিয়ে ট্রেন খানা ছেড়ে দিলে। আমি তখন এতদূর পিপাসার্ত্ত যে জল না খেয়ে আসতে পারলাম না। গাড়ী আমাকে ফেলে ধীরে ধীরে তার পর জোরে জোরেই প্লাট-ফরম্ ছেড়ে চলে গেল। —

জল খেয়ে কতকটা সুস্থ হব না আর এক উপসর্গ এসে জুট্‌ল। ষ্টেশনের একটি বাবু আমাকে দেখেই হাত খানা বাড়িয়ে দিয়ে ব'ললেন "কই গো তোমার টিকিটখানা দেখি ?"

বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। হতভাগিনী নিরাশ্রয়া আমি টিকিট ত আমার ছিল না কি দেব তাঁকে? গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে, দু একবার কেসে কাঁদ কাঁদ হ'য়ে তাঁকে বললাম "আমার কাছে ত টিকিট নেই; আমি গাড়ীতেই যাচ্ছিলাম, জল খেতে এসেচি আর গাড়ী ছেড়ে দিলে।"

বাবুটি ভাবলেন হয় ত আমার সঙ্গের লোকজন সব গাড়ীতেই আছে। আমি সঙ্গীহারা হ'য়ে প'ড়েছি টিকিটও আমার তাদের কাছে আছে। স্ত্রীলোক আর আমার মত একলা অসহায় হ'য়ে

কে কোথা বেরোয় বল? সুতরাং তাঁর আন্দাজ করা ভুল হয়নি। তবু ও তিনি অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তার-পর আমায় ব'ললেন "তুমি ব'স এখানে; খানিক পরে আর একটা ট্রেন আছে, যেখানে যাবে সেই গাড়ীতে গেলেই চ'লবে। আমি ঠিক সময়ে তোমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে যাব এসে।"

নিরুপায় হ'য়ে আমি সেখানেই ব'সে রইলাম। তোমরা যে গাড়ীটায় সেদিন এলে সেটার একটু পরেই আর একখানা ট্রেন এসে তখন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল। সেই দয়ালু বাবুটি এসে আমাকে গাড়ীতে তুলে দিতে চাইলেন আর কোথাকার টিকিট কিনতে হবে সে কথাও জিজ্ঞেস ক'রলেন। আমার কি আছে যে তাই দিয়ে টিকিট কিনব আর স্থানই বা ভূভারতে কোথায় আছে যে সেখানে যাব? তিনি একবার নয় দুবার তিনবার জানতে চেয়েছিলেন—কোথা যাব আমি। আমি কিছু জবাব দিতে পারলাম না দেখে তিনি কাজের তাড়ায় সেখান থেকে চ'লে যেতে বাধ্য হ'লেন। ঠিক তার পরেই উমা বউদি! তুমি স্বর্গের দেবতার মূর্ত্তি নিয়েই অভয় হস্ত বাড়িয়ে দিলে আমাকে সে বিপদের মুখ থেকে টেনে আনতে। অতীতের দুঃখ অনাহারের গ্লানি সব ধুয়ে মুছে তোমার বুকের কাছটিতে আমায় টেনে নিলে। একঘেয়ে দুঃখের আক্রমণ থেকে কিছু-দিনের মত আমিও রেহাই পেলাম। আর ত তেমন কিছু বলবার

নেই ; রাত্তির হ'য়ে এল চল বাড়ী যাই। নিখিলদা তোমার চা খাওয়াত হ'ল না আজকে ? সব আমিই গোলমাল ক'রে দিলাম দেখছি।

"না না চা আজ আর খাবনা আমি। তা ছাড়া আজ কোথাও বেরুতেই হবে না। চল ঘরে ব'সেই গল্প করা যাক্। কিন্তু এত দুঃখ তুমি পেয়েছিলে রেনু, তবু তোমার দাদার ঘরে আসার কথাটা একদিনও মনে হ'ল না ?"

"ঐ যে ব'ললাম দাদা! মতলব ক'রেছিলাম রতন পুরেই প্রথমে যাব। কিন্তু ডাক্তার বাবুর স্ত্রী হঠাৎ ঝি খুঁজে পেলেন না তাই আটকে রাখলেন। জোর করবার ত আর সাধ্য ছিল না। তা ছাড়া কপালে এত ভোগাভোগ লেখা আছে সে গুলোও ত ঘটা চাই।"

"কিন্তু শ্বশুর বাড়ী গেলে কেন ? সেখানে যাওয়ার ত কোন প্রয়োজন ছিল না, খালি খালি কর্মভোগ।"

"সেও কপালের ফের ছাড়া আর কিছুতে নয় দাদা! আর সত্যি কথা ব'লতে কি, আমার তখন মনে হ'য়েছিল হয়ত বা সে দেশে গেলে স্বামীর দেখা পেলেও পেতে পারবো। আমার যে তখনকার কি অবস্থা—বাপের ঘর ছেড়ে এসেচি, সেখানেও আর যাবার পথ নেই, সমাজের মহারথীরা ত সে দেশেও বাস করেন, হয়ত ব'লে ব'সবেন—ঘর ছেড়ে রাস্তায়

বেরিয়েছিল অতএব দাও ওকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বিদেয় ক'রে।"

"সে কথাও মিছে নয়। কিন্তু তখনও ত রতনপুরে গেলে পারতে। সে সময় ত তোমার ডাক্তার বাবুর গিন্নী ছিল না যে আটকে রাখতো।"

"বিপদে পড়লে মানুষ সবদিক ভুলে যায় বউদি, তাই কি জানি কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। যাবার একটা ঠিকানা শুধু এই দেশ ছাড়া আর কিছু আমার জানা ছিল না কোন দিন। নইলে নিখিলদার সেদিনকার অত অনুরোধেও আমি তখনই তার সঙ্গে গেলাম না কেন?

"কিন্তু রাত যে অনেকটা হ'য়ে পড়ল, বউদি! ওঠো আর চুপ ক'রে ভেবে কি হবে? আমার এ ছন্নছাড়া কপালটাকে ত জোড়া তাড়া দিয়ে চালাচ্ছই তোমরা এর বেশী ত আর মানুষে কেউ কোন দিন ক'রে উঠ্‌তে পারেনি! এখন চল ঘরে যাই।"

"চল। ও, হাঁ আর একটা কথা—তোমাদের সে ধীরেশ বাবুর খবর কি গো? কই আজও ত তিনি ফিরলেন না?"

নিখিলদা ব'ললে "সেত সেই আসানসোলের হাঁসপাতালে পড়েছিল; তারপর সেখান থেকে সেরে উঠে কোথায় যে গেল সে খপর ত আজও পেলাম না।"

আমি হাঁ ক'রে দুজনকার কথাবার্তা যেন গিল্‌ছিলাম। হা

ভগবান! এমন ভাগ্যি কি আর হবে! আর কি সে প্রাণের দেবতাকে এ শূন্য বুকের মাঝখানে ফিরে পাব কোন দিন? নিখিলদা ব'ললে "হঠাৎ এ সময় তোমার ধীরেশের কথা মনে হ'ল কেন উমা?"

"হুঁ পুরুষ কিনা! অতটা ধারণা কর্‌বার শক্তি কোথা তোমাদের! বোন্ বোন্ ক'রে পাগল হ'য়েই আছ; কিন্তু একটি দিনও কি জান্‌তে চেয়েছ তার স্বামীর নামটি?"

"তবে কি ধীরেশই আমাদের—"

"হাঁ গো হাঁ। তবে কি তোমাদের ধীরেশই—আমাদের রেণুর স্বামী, অনচ এতদিন ধ'রে যে রেণুর স্বামী এখানেও চাকরী ক'র্‌তেন আর ধীরেশবাবুর কাছে ত তাঁর সকল ঘটনা সব জেনেছ তবু তোমার খেয়াল হ'ল না? সাধে ব'ল্‌লাম ঐ যে—পুরুষ কিনা তোমরা?"

"তা হ'লে এখন কি কর্ত্তব্য? হ'তে পারে ধীরেশ হয়ত আর এখানে চাকরী ক'র্‌বে না কিন্তু আমায় সে একটা খপরও দিলে না কেন? নিশ্চয়ই সে আর কোথাও অসুখে প'ড়ে আছে।"

"এমনও ত হ'তে পারে—রেণুর মত তিনিও স্ত্রীকে খুঁজে বেড়াচ্চেন।"

"তাহ'লে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে একবার তাকে খুঁজে পেতে দেখি আর ত চুপ ক'রে থাকা কিছুতে উচিত হচ্চে না।"

"তাই দেখ। আহা! রেণুর মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না। এই কাঁচা বয়েস তার, তবু যেন সব সাধ আহ্লাদ এক স্বামীর অদর্শনেই ধুয়ে মুছে গেছে! এত ক'রেও খোঁপাটা তার বেঁধে দিতে পারলাম না কোনদিন—শ্যামাঠাকরুণের মতন এমন কালো চুলের রাশ এ কি শুধু এলিয়ে রাখবার তরেই?"

উমা বউদি তখন নিখিলদাকে এসব কথা ব'লতে ব'লতে আমার আলগা চুলটা হাতে হাতে জড়িয়ে দিচ্ছিল। আজ খালি খালি সেই কথাটাই আমার মনে হ'তে লাগল যে, একদিন দেবতার চরণ ছুঁয়ে যে কবরী আমার ধন্য হ'য়েছিল যার ভুবাহু দিয়ে জড়ানো নিবিড় আলিঙ্গনে আকুল-কবরী আমার শিথিল হ'য়েছিল আজ সেই দেবতার অদর্শনে আমি কেমন ক'রে এ শিথিল-কবরী আটকে রাখি!

——

ধীরেশের কথা।

সম্পূর্ণ নিরাময় হ'য়ে আসানসোলের হাঁসপাতাল থেকে যেদিন আমি ছাড়্‌পত্র পাই সেদিন একটা কানাকড়িও আমার পকেটে ছিল না। ব্যারামের সময় একটি বাঙ্গালী প্রৌঢ়া নার্সের সঙ্গে আমার খুব জানাশুনা হ'য়েছিল। এই সন্তানহীনা রমণী আমাকে ঠিক পেটের ছেলের মতন আদর যত্ন ক'রেই রোগমুক্ত ক'রেছিলেন। আসবার সময় তাঁর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে তিনি অনেক কান্নাকাটি ক'রলেন—আর মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা দিতে যথেষ্ট অনুরোধ ক'রলেন, আরও আশ্চর্য্য—আমার পকেটে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে ব'ললেন, "তোমার কাছে যে কিছু নেই তা আমি জানি, যেখানেই যাও টাকার দরকার পা বাড়ালেই হবে, এক জায়গায় স্থায়ী হ'য়ে, ইচ্ছে হয় আমার এ টাকাটা পাঠিয়ে দিও কিন্তু না দিলেই আমি বেশী খুসী হব।"

সেই অযাচিত দান বা ঋণ যাই হোক্—সম্বল ক'রে আমি বরাবর কাশীতে এলাম। কোলিয়ারীতে গিয়ে আবার চাকরী ক'র্‌তে কি জানি কেমন আগ্রহ হ'ল না। নিখিলকে সব কথা জানিয়ে একখানা চিঠি দেব ভাব্‌লাম কিন্তু তাও আজ-কাল ক'রে আর নানা ঝঞ্ঝাটে প'ড়ে হ'য়ে উঠ্‌ল না। কাশীতে

পৌঁছে যা হোক্ ক'রে শুধু পেটের ভাত আর পরণের কাপড়ের মত যেমন তেমন চাকরী জুটিয়ে নিয়ে নিখিলকে জানাবো সব কথা, এইটুকুই সঙ্কল্প ছিল

কাশীতে এসে বাবা বিশ্বনাথকে প্রাণভরে দর্শন ক'র্‌লাম। এ গলি সে গলি ঘুরে ঘুরে কিছুই যোগাড় ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লাম না; শেষে একটা অন্নসত্রে ঢুকে পেটের জ্বালা জুড়িয়ে রাত্রিটাও সেখানেই কাটিয়ে দিলাম।

এখানে আসে লোকে পরকালের কাজ ক'রতে, প্রাণের জ্বালা জুড়োতে, দেবাদিদেবের পায়ে মনের ব্যথা জানাতে; কিন্তু আমি এমনি হতভাগ্য যে, আজ পেটের দায়ে চাক্‌রী খুঁজে বেড়াচ্ছি। প্রাণের ব্যথা বিশ্বনাথের পায়ে ত অনেকদিন থেকেই জানিয়ে আস্‌চি কিন্তু সে সৌম্যমূর্ত্তি পাষাণ দেবতা পাষাণ হ'য়েই রইলেন ভক্তের কথা একটি দিনও ত কই কাণ দিয়ে শুন্‌লেন না। আর ভক্তও বোধ হয় অনন্যশরণ হ'য়ে ডাকার মতন ক'রে ডাক্‌তেও কোনদিন শিখ্‌লে না।

মা অন্নপূর্ণার দয়াতে বারানসীতে কেউ কখনো অন্নের ভাব্‌না ভাবে না, আমাকেও তাই ভাব্‌তে হ'ল না কিন্তু এখানে সেখানে খেয়ে আর রাস্তাঘাটে শুয়ে রাত কাটিয়ে আর চ'ল্‌লো না। অনেক চেষ্টা চরিত্র করার পর

এক বৃদ্ধ কাশীবাসী বাঙ্গালীর বাড়ীতে খাওয়া থাকা আর নগদ কিছু নিয়ে তাঁর সরকারের চাকরী পেলাম। যাক্ নিশ্চিন্দি, এইবার আমি বাঁচ্‌লাম, এই যে আমার মতন নিঃঝঞ্ঝাটি লোকের ঢের বেশী। রোজগার ক'রে জমাবার মত অবস্থা আমার নয়, আর কার তরেই বা জমাবো, বাপের ত্যজ্যাপুত্র তাই পেটের জন্যে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হচ্চে নইলে সংসারে আমার আছে কে? সব চেয়ে প্রবল আর মমতার বাঁধন যা তা আমার থেকেও না থাকা, এতদিন বাবা বিশ্বনাথকে কেঁদে কেঁদে জানালাম কিন্তু তবু কি এ নীরস মরুর মত হৃদয় কুঞ্জটায় কোনদিন বসন্তের একটা দমকা বাতাসও এসে এ উদাস ভাবটাকে কাটিয়ে দিলে? না না একটি পল একটি অনুপলের তরেও না। তবে আর কেন মিছি মিছি ভূতের ব্যাগার খেটে মরি? কার জন্য? কে আছে আমার? পিতামাতা? দেশ? জন্মভূমি? কিন্তু কেন? তারা ত আমায় চাইলে না। তারা ত স্নেহের অনুরোধেও আমার এ অল্প বিস্তর যাই হোক্ অপরাধটা ভুলে কোনদিন কোলে তুলে নিলে না? তবে কেন—কেন? আমার এই বেশ। এখানে নিন্দা নাই, অভাব অভিযোগ নাই, দোষ গুণ নিয়ে মুখে মুখে নির্ম্মম বিচার নাই—সর্ব্বোপরি ক্রূর স্বেচ্ছাচারী নির্দ্দয় সমাজের বিকট চোখ্ রাঙানী নাই। কতকগুলো অকেজো ভেতো পরপদলেহী মোসাহেবের

তে সেই হাড়গোড়-ভাঙ্গা সমাজটার নেতাও নাই—যারা নিরপরাধা অবলার ওপর অযথা অত্যাচার ক'রে তাকে স্বামী সৌভাগ্য-বঞ্চিতা ক'রতে দ্বিধা ক'রে না, যারা স্বার্থের খাতিরে নিজের ভাল দেখ্‌তে একজনের সারাজীবন ভ'র একশোটা বিয়ে দিতেও সরমের ঘায়ে মুস্‌ড়ে পড়ে না, যারা আভিজাত্যের ব্যর্থ অভিমান নিয়ে ঘুরে বেড়ায় অথচ আপনার ভাল ক'র্‌তে গোপনে গোপনে অন্য পাঁচজনের অসাক্ষাতে—ঘেয়ো কুকুরের মত ছত্রিশ জাতের পাতের ভাত কুড়িয়ে খেতেও ঘৃণা ত দূরের কথা মনের কোণে এতটুকু ক্ষীণ লজ্জাও ঠাঁই দেয় না। নেতা—সমাজপতি সমাজ! হারে আমার পঙ্কিল আবিলতামাখা পূতিগন্ধ ছড়ানো গলিত শবদেহের ছিন্নাংশরে! ওরে—ও অধমরে! নীচরে! বিরাটধ্বংসস্তূপের নগণ্য ক্ষুদ্র ধূলিকণারে! তোর আবার গর্ব! তোর আবার চোখ রাঙানো! তোর আবার দাঁত খিঁচুনী দেখিয়ে শাসন করা! যেদিন ছিল, সেদিন যা ক'রেছিস্ মুখে কেউ কথাটি কয়নি—তাই মাথা নুইয়ে সবাই মেনে নিয়েচে। যতদিন গুণ থাকে, ততদিন গুণী সে, কিন্তু এখন কেন আর? যার নূতন ক'রে সংস্কার করণের মসলার দাম নাই ভাণ্ডারে, তার আবার ব্যর্থ আস্ফালন দেখান কিসের জন্য? সর্ব্বস্ব খুইয়ে বাজ্‌পড়া শুক্‌নো গাছের ডালে ব'সে কঙ্কালসার চামড়ায় জড়ানো ক্ষীণ তনু নিয়ে দুর্ভিক্ষের দেশের

হনুমানের মতন নিষ্ফল দাঁত খিঁচুনী দেখিয়ে আর কি ফল হবে তোর ?

* * * * * *

আমার বৃদ্ধ মনিবের বাঙ্গালীটোলায় কয়েকখানা বাড়ী আছে। ভাড়াটেদের কাছ থেকে মাসে মাসে আমাকেই ভাড়া আদায় ক'র্‌তে হয়, একদিন সকালবেলায় এমনি একটা বাড়ীতে ভাড়ার তাগাদায় গিয়ে দরজায় কড়া নেড়ে ডাকতেই একটি প্রবীণ ভদ্রলোক এসে দরজা খুলে আমার দিকে চাইতেই আমরা দুজনেই অতি মাত্রায় বিস্মিত হ'য়ে গেলাম, দেখিনা—আমার শ্বশুরমশায় রেণুর পালকপিতা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এবারে আর সেদিনের মত বাড়ীর দরওয়ান ডেকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন না।

আমার মনের অবস্থা তখন বর্ণনাতীত। আবার কতকাল, কতকাল পরে বাবা বিশ্বনাথের অকৃপণ দয়ায়—সেই সাধের প্রণয়-লতাটীকে হৃদয়ে ধর্‌তে পাব আমি। আমার রেনু—যাকে ধ্যানেই পেয়ে এসেছি এইবার বাইরেও তার সুকোমল তনুখানি নিয়ে এ বুকের দাবানল নিভাতে পারবো। কিন্তু ওরে আমার আগুনে পোড়া হতভাগ্য ভাগ্য! তোর সাধ যে মিটবার নয়রে! তুই মিছে আর কিসের আশা করিস্ তবে ?

পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদের পর দুর্গানাথবাবু—(এতক্ষণ বলা হয়নি আমার শ্বশুরের নাম শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ বসু।) আমাকে বাড়ীর মধ্যে আদর করে ডেকে নিয়ে গেলেন। হর্ষ-বিকম্পিত বুকখানাকে চেপে ধরে আমি কত দীর্ঘবিরহের অবসান করতে বাড়ীর ভেতর ঢুকলাম। কিন্তু কি করুণ দৃশ্য। আমার শাশুড়ী—রেণুর মা, আমাকে দেখেই চীৎকার করে কন্যার নাম ধরে কেঁদে উঠলেন। বুঝলাম, অভাগিনী নিরপরাধা বালিকা এ মর্ত্তজগৎ ছেড়ে গেছে

তারপর অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল। একথা সেকথায় জানতে পারলাম আমারই দর্শন পাবার আশায় রেণু আমার কাকেও না জানিয়ে হঠাৎ একদিন বাড়ী ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। তার যাওয়ার পরদিন থেকে অনেক স্থান তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এ দুর্ভাগা স্নেহশীল পিতামাতা তাঁদের বুকের ধন কন্যারত্নটির সন্ধান পাননি।

স্থানীয় সমাজপতিরা যখন খুঁজে পেলেও আর সে গৃহ-ত্যাগিনী কন্যাকে গৃহে জায়গা দেওয়া হবে না—অভিমত প্রকাশ ক'রলেন, তখন এই দুঃখী দম্পতী যদি খুঁজতে খুঁজতে কোনদিনও হারানো ধনের সন্ধান মেলে—এই আশায় শেষ বয়সের সম্বল বার্দ্ধক্যের বারানসীতে এসে বাসা নিয়েছেন। যদি কোনদিন কন্যার সন্ধান মেলে তাকে বুকে ক'রেই জীবনের বাকি দিনগুলো

সুখে কাটিয়ে যেতে পারবেন। আর যদি সে সৌভাগ্য নাও ঘটে তথাপি কাশীবাসটাও ত হবে।

দুজনেই অনেক মাথার দিব্য দিয়ে আমাকে তাঁদের সঙ্গে এক বাসাতেই থাক্‌তে অনুরোধ ক'রলেন কিন্তু আমি রাজী না হওয়াতে অবশেষে রেণুর মা আমার হাতদুটি ধ'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ল্‌লেন "বাবা! ভুল সবারই হয়, আমাদেরও একদিন তাই হ'য়েচে; তার ফলে আজ ত জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছি; মেয়েটা গেছে, পেটে একটা নেই যে নিয়ে নাড়াচাড়া করি। যদি এ পোড়া কপালে আবার সে কোনদিন আসে, আসবে কিন্তু তুমি আর আমাদের ছেড়ে থেক না। আমাদের কাছে থাক্‌তে যদি তোমার ভাল না লাগে—অন্ততঃ দিনে দুবেলা দুটিবার এসে দুঃখিনী মাকে 'মা' ব'লে ডে'ক। তবু রেণুর শোক কতকটা সামলাতে পারবো।"

সেদিনকার মত তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে আমার মনিবের বাড়ী ফিরে এলাম। টাকার তাগাদা আর তখনকার মত হ'ল না।

কাজকর্ম্ম যা ছিল শেষ করে সন্ধ্যাবেলা আবার গেলাম দুর্গানাথ বাবুর বাড়ী। সদর দরজা বাহির থেকে বন্ধ দেখে ফিরে আসচি—এমন সময় দুর্গানাথ বাবু পেছন থেকে আমায় ডাকলেন "কে ধীরেশ? যেওনা বাবা! আমরা আরতি দেখতে মন্দিরে গেছ্‌লাম। এস বাড়ীর ভেতর।"

কথায় কথায় অনেকক্ষণ কেটে গেল। তখন অনেকটা রাত্রিও হ'য়েচে, আমার শাশুড়ী ব'ললেন "বাবা ধীরেশ! চারদিকে বড্ড বেশী ভেদ বমী হ'চ্চে লোকের—আজ আর রাত ক'র না। কাল সকালেই যেন এদিক দিয়ে এসো একটি বার। আর কাল দিনের বেলা এখানেই দুটি খেয়ো আমি তার যোগাড় ক'রবো।"

বাসায় যখন ফিরে এলাম তখন রাত্রি দশটা বাজে বাজে। বাড়ী ঢুকতেই গলির মোড়টায় হরেন ডাক্তারের গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। ভেতরে গিয়ে দেখি সত্যিই হরেন ডাক্তার ব'সে আছেন বৈঠকখানার পাশের কুঠুরী-টায়। শুনলাম মনিবের কলেরা হ'য়েচে। বাসার স্ত্রীলোক ব'লতে কেউ ছিল না। আমার মনিব, তাঁর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় ভাগ্নে, একটি চাকর আর সরকার আমি এই নিয়ে সংসার। এত লোক থাকতে এই ভীষণ রোগ বেছে বেছে আমারই দয়াল মনিবকে চেপে ধ'রেচে।

ডাক্তারকে সংক্ষেপে রোগীর কথা জিজ্ঞেস ক'রে তাড়াতাড়ি কাপড়টা ছেড়ে ফেলে অর্দ্ধচৈতন্যলুপ্ত আমার মনিবের বিছানার পাশটিতে গিয়ে ব'সলাম আর বিধাতার নির্ম্মম বিধানে উঠলাম তাঁর শেষ নিশ্বাস অসীমের কোলে মিশে যাবার পরে—তাঁর ঐহিক নশ্বর দেহটার সৎকার করবার জন্য লোক ডাকতে।

দুর্গানাথ বাবুর কথা।

"কাল ত ধীরেশ এর চেয়ে অনেক সকালে এসেছিল, আজ এত দেরি হচ্ছে কেন গো?" ব'লে আমার স্ত্রী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আমি জবাব দিলাম "পরের কাজ করে ত, বোধ হয় মনিব কোথাও পাঠিয়েছেন। তুমি এখানে খাবার কথা তাকে কাল বলে দিয়েছ ত?"

"হাঁ।"

তা হ'লে সকালকার কাজ কর্ম্ম সেরে স্নরেই একেবারে আসবে বোধ হয়। তুমি এরই মধ্যে রান্না স্নরু ক'রেছ নাকি? আজ তা হ'লে জামাইকে খুব ভাল ক'রেই খাওয়াবে?

"কপালে ত আর সে স্নখ মেলেনি কোনদিন। আজ এ দুঃখের ভেতরে থেকেও স্নযোগ যখন মিলেছে তখন আর কেন তা হারাই? যা হয় ক'রে বাছাকে খাওয়াতে ত হবে? আহা! আমাদের পাপেই বেচারা মা বাপের কোলও হারিয়ে ব'সে আছে। তা না হ'লে আজ ওর কিসের অভাব বল না?

"কপাল, কপাল। যার যা অদৃষ্টের লিখন সে ত ফ'লবেই একদিন; তার আর তুমি আমি কি ক'রবো বল? তবে ধীরেশের এ পারনামের জন্য নিমিত্তের ভাগী আমরা নিশ্চয়ই।"

"আহা! আজ যদি মেয়েটা থাকতো, কি ভীমরতিই হ'ল তোমার তখন। জামাইকে অপমান করে দিলে তাড়িয়ে মেয়েটার মুখের দিকেও একটিবার চাইলে না। সতী সাধ্বী মা আমার স্বামীর অপমানটা আর বরদাস্ত ক'র্‌তে পারলে না। আর কি এতদিন সে বেঁচে আছে?"

"থামো তুমি। আর সকাল বেলা চোখের জল ফেলে নিজে কেঁদে আমাকেও কাঁদিও না। শেষ বয়সে এত কষ্ট ভোগ কপালে আছে—কি আর হবে।"

"উঃ পেটেরও যদি একটা থাক্‌তো। এ বুড়ো বয়সে কি নিয়ে কাটাই—"

"ভগবান কে ডাক। বাবা বিশ্বনাথের চরণ চিন্তা করে কাটাও।"

"তাইত—একবারটি দেখ না কেন বাছার আসতে এত দেরি হচ্ছে।"

ধীরেশের মনিবের বাড়ীতে গিয়ে দেখি সব চুপ চাপ্। যেন এইমাত্র কি একটা ভয়ানক বিপদ হ'য়ে গেছে সেখানে। ধীরেশকে চুপটি ক'রে বাইরের ঘরে খাতা লিখতে দেখে সেখানেই ঢুকলাম। তার চেহারা কি শুক্‌নো—চোখ কোটরে ঢুকে গেছে, চুল রুক্ষ; যেন কাল রাত্তিরের দেখা সে মানুষই নয়। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস্ ক'রতেই সে ব'ললে, গত রাত্রিতে তার মনিব হঠাৎ

কলেরা হয়ে মারা গেছেন ; এইমাত্র শ্মশান থেকে এসেই সে খাতা লিখতে ব'সেচে। আরও ব'ল্‌লে—আপনি একটু বসুন আমি হিসেব নিকেশটা আমার নতুন মনিবকে বুঝিয়ে দিয়েই আপনার সঙ্গে এখান থেকে একবারেই যাব। আমার বর্ত্তমান প্রভুর কাছে চাকরী করা কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। বিশেষতঃ যেখানে এতদিন হুকুম চালিয়ে এলাম সেখানে হুকুম মেনে চলা আমার দ্বারা হ'য়ে উঠ্‌বে না।

*   *   *   *

ধীরেশ কিছু খাবার খেয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো আর আমি গঙ্গাস্নানে গেলাম। ফিরে এসে দেখি অভাবনীয় ব্যাপার—

ধীরেশও কলেরায় আক্রান্ত হ'য়েচে। সর্ব্বনাশের ওপর সর্ব্বনাশ। কিছুই ভেবে ঠিক ক'রতে না পেরে আমি ডাক্তার ডাক্‌তে যাচ্চি সে আমায় ব'ল্‌লে, "ডাক্তার ডাকবার আগে নিখিলকে আর আমার বাবাকে দুজায়গায় দুখানা 'তার' করে আসুন। আপনাদের শুধু কষ্টই দিলাম, আমি বোধ হয় এ যাত্রা আর রক্ষে পাব না ; আসল এসিয়াটিক কলেরা যাকে বলে আমারও ঠিক তাই হ'য়েছে।"

তার বন্ধু নিখিল ও তার বাবাকে খবর পাঠিয়ে ডাক্তার নিয়ে বাসায় এলাম—তখন রোগ পূর্ণমাত্রায় বেড়ে উঠেচে, নিয়তির লিখন! আজ আমার মত হতভাগ্য বুঝি ভূভারতে কেউ নেই।

সব হারিয়ে ধীরেশকে পেয়েও বুকের মাঝে একটুখানি আশার ক্ষীণ আলো মিটমিট ক'রে জ্ব'লছিল কপালের দোষে আজ তাও নিভে যায়।

ডাক্তার দর্শনী নিয়ে মুখ অন্ধকার ক'রে গাড়াতে উঠলেন— জানিয়ে গেলেন রোগ খুবই কঠিনে দাঁড়িয়েচে বাঁচবার আশা খুবই কম। তবে ভগবানের হাত

যা হবার তাত হবেই। এখন যাদেরকে আনতে 'তার' ক'রে এলাম তারা এলে যে আমি বুকে বল পাই। ভগবান্ সর্ব্বময় তুমি, অনন্ত চোখ দুটি ত তোমার সর্ব্বত্রই র'য়েচে অগোচর ত কিছুই থাকে না কোন দিন। আজ এ পিতৃ-মাতৃ পরিত্যক্ত হতভাগ্যের শেষের সাধটুকু আর অপূর্ণ রেখ না প্রভু! দয়াময়! বাঞ্ছা কল্পতরু তোমার নাম, মরণের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েও কঠোর সংসার তাপদগ্ধ এ হতভাগ্যের মরণের সময়কার সাধ যেন তার মেটে। কাশীনাথ! শান্তির বাতাসে এ ক্লিষ্ট যুবকের অন্তিমের দিনটিকে শান্তিময় ক'রে দাও ঠাকুর।

ভরপুর সন্ধ্যা। বিশ্বনাথের সুবিশাল মন্দির থেকে আরতির গুরু গম্ভীর আওয়াজ এসে মনে প্রাণে এক পবিত্রভাব জাগিয়ে তুলচে। সাধু সংসার বিরাগীর কণ্ঠের ভগবৎ আরাধনার পবিত্র গাথা সন্ধ্যার বাতাসে ভেসে এসে মনটাকে উদাস ক'রে জানিয়ে দিচ্ছে—ওগো! আর কেন? লীলার দিন ত ফুরিয়ে এল পারে

যাবার যোগাড় কর। বৈতরণীর খেয়ার তরী যে পাল তুলে দাঁড়িয়ে আছে তোমারই প্রতীক্ষায়! ওঠো! জাগো! আশার ঘুম ত অনেক ঘুমিয়েচ, স্বপ্ন মদিরা পানে ত মাতাল হ'য়ে অনেক দিন অনেক দীর্ঘ রাত্রি কাটিয়ে দিয়েচ আর কেন? নেশা কাটাও! মাঝী যে তোমারই তরে গান গেয়ে গেয়ে সারা হ'য়ে গেল। চলো! ওগো আর কেন ওঠো! আর কিসের মায়া? কিসের বাঁধন?

দরজায় গাড়ী এসে লাগার শব্দে সচেতন হ'য়ে ধীরেশ নিজেই ব'ললে "দেখুন কে এল বুঝি। উঃ আর যে পারি না। এখনও কি আসবে না? দেখা কি আজও পাব না? অপূর্ব্ব আশার বোঝা বুকে ক'রেই কি শেষের দিনটিও কাটিয়ে যেতে হবে? ওগো এসো! একটিবার দেখা দাও! আঃ—বাবা! মা! তোমাদের মনে কষ্ট দিয়েই আজ আমার এ দশা। ওগো! আর ত এলে না তুমি, দেখা ত আর হ'ল না তোমায় আমায়—এসো—রেণু! কণা!—রেণু—এখনও কি আসবে না?

"ওগো এসেচি, তোমার একটি দিনের আদরে আদরিনী রেণু তোমার এসেচে, ওগো! আজ যাবার সাজে সেজে কেন তুমি আমায় ডাকলে? যাবে যদি কেন আগে আমায় জানতে দিলে না? ওগো! আমিও যে সারা ভুবন খুঁজে বেড়িয়েচি তোমার আশায়—আজ এ কি বেশে পেলাম তোমাকে? মিলনের

রাতে কোন নির্দ্দয় এমন পাঁজর ভাঙ্গা করুণ বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়ে দিলে ?

"আমার কণাটুকু ! আমার রেণু ! উঃ বুক যে ফেটে যাচ্চে —ওগো ! কে আছ ডাক্তার ডাক, আমাকে বাঁচাও—আমি ম'রতে পারব না। বিশ্বনাথ ! দিলে যদি সব তবে জন্মের মত কেন আমায় তা পাওয়া থেকে বঞ্চিত ক'রবে ? আমাকে বাঁচাও ঠাকুর ! আমি রেণুকে ছেড়ে কোথাও যাব না, যাব না !"

আমার অদৃষ্টে এত দুঃখও লিখেছিলে ভগবান ! কোথায় আজ মেয়ে জামাই নিয়ে আনন্দ করবো না দুজনেরই সর্ব্বনাশ চোখে দেখতে হ'ল। নিখিলনাথ আর তার স্ত্রী উমা দু'জনে দুপাশে ব'সে ধীরেশের সেবা ক'রছে আর অভাগিনী রেণু স্বামীর পাশে প'ড়ে আছে। আমার স্ত্রী তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিতে যাওয়ায় উমা ব'ললে "আহা ! হতভাগীর যে সুখের বাসরে আজ আগুন লেগেচে ওখানেই থাকতে দিন ওকে।" আজ কোন পাষাণী তার পাষাণ হাত বাড়িয়ে তাকে সরিয়ে আনবে সেখান থেকে ? মানুষ ! ওরে পঙ্গু ! ওরে অপারক ! আজ এদিনে কী করবার ক্ষমতা আছে তোর ? কতটুকু ?

ধীরেশের মা বাবাও এসে প'ড়লেন। আজ এত দুঃখেও বিশ্বনাথ ! তবু তোমায় দয়াময় ব'লতে হবে।

শোকাতুর ধীরেশের মা বাবার অবস্থা আর কত লিখে

জানাবো। পুত্রের পাশটীতে ব'সে তাঁদের আর বুক ভাঙ্গা হা হুতাশের বিরাম নেই।

ধীরেশ যাবার সময় একবার চারিদিকে চেয়ে মা বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে—নিখিলকে ডেকে ব'ললে "নিখিল। সবাই রইল তাদের দে'খ। আমার দুঃখী মা বাবার দেখা শোনার ভার তোমার ঘাড়ে দিলাম। উমা! তোমাকে আজ প্রথম আর শেষ দেখচি—তোমায় আর কি ব'লব—আমার রেণুকে সান্ত্বনা দিতে—তাকে আমার—শোক ভুলিয়ে রাখ্‌তে তোমায় রেখে গেলাম। তার সব ভার তোমার।

"রেণু! ওঠো আর ঘুমিও না বুক যে অসাড় হ'য়ে গেছে কণা! ওখানে ত আর সাড়া পাবে না। একটু জল দাও। আজ এ অন্তিম মুহূর্ত্ত আমার কত সুখের কি সুন্দর! কত মধুর! আঃ তৃপ্তি—রেণু! কণা—আমার!

রেণুকণার কথা।

এ পোড়ামুখ নিয়ে আর আমার দাঁড়াবার ইচ্ছা ছিল না আপনাদের পাঁচজনের সামনে। তবু আজ এসেছি আপনাদের পায়ে হতভাগিনীর শেষ বিদায় জানিয়ে যেতে, আমি আবার এসেছি।

আমাকে চিনতে পারবেন কি আজ? আমি সেই রেণুকণা। যাকে দেখেছিলেন—বধূর বেশে বরের আশে আকুল কবরী বেঁধে মোহন সাজে সাজতে, যাকে দেখেছিলেন দেবতার অনুসন্ধানে দেশে দেশে অনাথিনীর বেশে ঘুরে বেড়াতে, যাকে দেখেছিলেন দাদার ঘরে আদরিণী বোনের মূর্ত্তি নিয়ে স্বামীর বিরহে অনাঘ্রাত ফুলটির মতন শুকিয়ে যেতে,—তারপর—তারপর যাকে দেখেছিলেন একদিন নিজের হাতে বুকের কলিজা ছিঁড়ে কাশীর মণিকর্ণিকার শ্মশান ঘাটে ভাসিয়ে দিতে—আমি সেই রেণুকণা।

আশায় আশায় থেকে এতদিন আমার সব ছিল—আজ নিরাশার আঁধারে দাঁড়িয়ে সব হারিয়ে ব'সে আছি। আজ কিছু নাই—নাই—নাই আমার কিছু।

আজ সে সুখের বাসরের উৎসব মালাটির ছিন্নসূত্র আছে আছে—মালা নাই। সেই সে মধু যামিনীর স্বর্ণময় সুখস্মৃতি আছে—সুখ নাই। সেই সে দেবতার পায়ে অঞ্জলী দেওয়া কবরীর চুলের রাশ তেমনি আছে কিন্তু তা আজও শিথিল—একেবারে চিরদিনের মতই শিথিল! শিথিল!!

শেষ

গ্রন্থকার প্রণীত "সোণালী" যন্ত্রস্থ

গ্রন্থকারের আর একখানি অভিনব সামাজিক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে।

"লক্ষ্মী-প্রতিমা"

দরিদ্র বঙ্গ গৃহস্থ-কন্যার বিবাহ সভার সকরুণদৃশ্য, পরদুঃখ কাতরা স্নেহময়ী বঙ্গরমণীর অকৃপণ হস্তের নীরব-দান, স্বামী-প্রেম-বিহ্বলা ক্ষুদ্রা কিশোরীর অদ্ভুত বুদ্ধি-চাতুর্য্য, প্রকৃত বন্ধুত্বের উজ্জ্বল মনোজ্ঞ ছবি একটির পর একটির সমাবেশে "লক্ষ্মী-প্রতিমার" অপূর্ব্ব প্রতিমাখানি প্রকৃতই বড় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। উপহার দিবার মত এমন ঘটনাবৈচিত্র্যময় সামাজিক উপন্যাস খুব কমই দেখা যায়।

অতিসুন্দর কাগজে ছাপা, সর্ব্বসাধারণের মনের মত করিয়া সিল্কের বাঁধানো—অথচ দাম মাত্র ১।০ একটাকা চারি আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্

কলিকাতা।